বিকশিত হোক শত ভাবনা

কোয়ান্টাম

মুক্তচিন্তা মনের জানালা খুলে দেয়। জোগায় নতুন প্রেরণা। আশাবাদ, ইতিবাচকতা আর কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জোর উদ্দীপনা খুঁজে পায় মানুষ। খুঁজে পায় জীবনের লক্ষ্য– সর্বতোভাবে যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে আত্ম–জাগরণের পথে এগিয়ে যেতে। এমন শত মুক্তচিন্তারই একটি সুখপাঠ্য সংকলন বিকশিত হোক শত ভাবনা।

দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সমাজ–সচেতন, কর্মপ্রাণ ও সার্থক মানুষদের চিন্তা জ্ঞান প্রজ্ঞার এক অনুপম সম্মিলন ঘটেছে এ সংকলনে। পাঠকের উপলব্ধি–জগতকে আলোড়িত ও সংহত করার পাশাপাশি যা তার চিন্তারাজ্যে সৃষ্টি করবে নতুন কল্যাণতরঙ্গ; দেবে আত্মবিকাশের পথে অক্লান্ত হেঁটে চলার সাহস ও শক্তি।

আমরা প্রত্যাশা করি, বিকশিত হোক শত ভাবনা সব বয়সী পাঠক বিশেষত তরুণ জ্ঞানার্থীদের কাছে হয়ে উঠবে একটি নিত্যপাঠ্য বই। তাদের উদ্বুদ্ধ করবে দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও আনন্দময় কর্মোদ্যমে।

প্রিয় পাঠক, আপনাকে স্বাগতম!

বিকশিত হোক
শত ভাবনা

বিকশিত হোক
শত ভাবনা

সংকলন ও সম্পাদনা
ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

বিকশিত হোক শত ভাবনা

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ ও বই নকশা

মাসুম রহমান

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা

রংধনু প্রকাশনী

৭১ রোকেয়া মনজিল, ৬ষ্ঠ তলা
৩৫ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

মূল্য

২৪০ টাকা

Bikoshito Hok Shoto Bhabna

Published by
Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $15

উৎসর্গ

বাংলাদেশে হৃদরোগ প্রতিরোধে
সচেতনতা সৃষ্টির পুরোধা ও
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন
অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা
জাতীয় অধ্যাপক
ব্রিগে. (অব) ডা. আব্দুল মালিক
৯০ বছর বয়সেও যার
প্রশান্ত প্রত্যয় আর অদম্য কর্মস্পৃহা
আমাদের অনুপ্রাণিত করে

শত ভাবনা বিকশিত হোক

শত ভাবনা বিকশিত হোক। শত চিন্তার প্রসারে ঘটুক ব্যক্তি ও জাতির ক্রম-উত্তরণ। কোয়ান্টাম শুরু থেকেই এ বিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। বিস্তৃত করেছে তার কর্মপরিধি। আর এই উদারনৈতিক দর্শনই কোয়ান্টামকে করেছে সর্ব পথের সর্ব মতের মানুষের মিলনস্থল। বাংলাদেশে এ এক অভূতপূর্ব অর্জন, সন্দেহ নেই।

কোয়ান্টামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা সময়ে আমন্ত্রিত হয়েছেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, সংস্কৃতিজন, প্রযুক্তিবিদ ও মানবপ্রেমী সমাজকর্মীসহ অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ। আত্ম উন্নয়ন ও মননশীলতা চর্চার লক্ষ্যে মুক্ত আলোচনা, একান্ত সাক্ষাৎকার কিংবা রক্তদাতা সম্মাননার মতো সামাজিক সচেতনতামূলক আয়োজনে তারা বলেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে। তাদের জ্ঞানঋদ্ধ আলোচনায় সমসাময়িক প্রসঙ্গের পাশাপাশি উঠে এসেছে সঙ্ঘবদ্ধতা, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ও মানবকল্যাণে কর্মব্যস্ততার সার্বজনীন গুরুত্ব। ব্যক্তির উন্নয়ন ও সামষ্টিক জাগরণে যার দূরপ্রসারী ভূমিকা সর্বস্বীকার্য। বিশিষ্টজনদের অভিজ্ঞতা-উৎসারিত এইসব কথামালারই একটি সময়োপযোগী সংকলন–*বিকশিত হোক শত ভাবনা*।

আমরা বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের ২৭ তম বর্ষ-পদার্পণলগ্নে প্রকাশিত এ সংকলন-গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠককে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। তাদেরকে অনুরণিত করবে জীবনকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিতে– নৈতিকতা, সেবা ও সমমর্মিতাই হবে যার ভিত্তি।

সবার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

সূচিপত্র

শিক্ষা

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী | ১২
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ | ১৮
অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম | ২৪
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন | ২৮
ড. এ কে আব্দুল মোমেন | ৩২
আবুল মোমেন | ৩৬
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ | ৪২
নুরুল আলম | ৪৬

সংস্কৃতি

আহমদ রফিক | ৫২
সৈয়দ শামসুল হক | ৫৬
ড. এম শমশের আলী | ৬০
খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ | ৭৮
অধ্যাপক রফিকুন্ নবী (রনবী) | ৮২
আবুল হায়াত | ৮৬
আসাদুজ্জামান নূর | ৯০
নাসির উদ্দিন ইউসুফ | ৯৪
আফজাল হোসেন | ৯৮
আহসান হাবীব | ১০২

চিকিৎসাবিজ্ঞান

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান | ১০৮
জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক | ১১২
জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন | ১১৬
অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার | ১২০
অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ | ১২৬
অধ্যাপক ডা. তাহমীনা বেগম | ১৩০
অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার | ১৩৪

প্রযুক্তি

জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী | ১৪০
অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী | ১৪৪
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ | ১৪৮
এম রেজাউল হাসান | ১৫২
ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম | ১৫৮
অধ্যাপক ড. মাহবুব মজুমদার | ১৬২
ড. রুবাব খান | ১৬৬

মানবপ্রেম

ভ্যালেরি টেইলর | ১৭২

event.quantummethod.org.bd

শিক্ষা

speech.quantummethod.org.bd

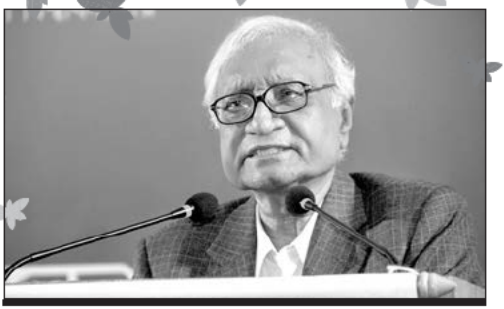

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।
বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রফেসর ইমেরিটাস। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য
এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে
অশীতিপর বয়সেও তিনি উচ্চকণ্ঠ।
সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
তিনি একজন পুরোধা।

event.quantummethod.org.bd

সঙ্ঘবদ্ধ না হলে মানুষ শক্তিহীন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশেষত তরুণ জনগোষ্ঠী আজ এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। একাকিত্ব আর বিচ্ছিন্নতা কিন্তু এক নয়; এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিচ্ছিন্নতা একটি রোগ। একজন মানুষ সবার মধ্যে থেকেও একা থাকতে পারেন, তাতে কোনো বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় না; ওটা তৈরি হয় মূলত তখনই–যখন তিনি নিজেকে কারো সাথে যুক্ত করতে পারছেন না।

নির্জনতা বা একাকিত্ব কখনো কখনো প্রয়োজনীয় হলেও নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতা একেবারেই অবাঞ্ছিত, যা বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে বাড়ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে–এই নিঃসঙ্গতা ও পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ আত্মস্বার্থ-সচেতনতা। এটা আসছে ভোগবাদিতা থেকে।

রবিনসন ক্রুসো টানা ২৩ বছর একটি নির্জন দ্বীপে একাকী কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি বিচ্ছিন্ন ছিলেন? তার সাথে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ছিল, ওটা তিনি পড়তেন। এর মাধ্যমে তিনি ধর্মের সাথে যুক্ত হলেন। একটা কাকাতুয়া ছিল, যেটির সাথে তিনি কথা বলতেন। একসময় একজন লোকও পেয়ে গেলেন, নাম দিলেন 'ফ্রাইডে'। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হলেন।

এর পাশাপাশি জাহাজ থেকে ক্রুসো কিছু উপকরণ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফসলের বীজ, খুন্তি, শাবল ইত্যাদি। এসবের সাহায্যে তিনি কিছু কাজের সাথে যুক্ত হলেন। ফলে তার সেই একাকী নির্জনবাসকে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

কখনোই বিচ্ছিন্নতা বলা যাবে না। অথচ আজ যে সমস্যাটা সর্বত্রই প্রকট আকার নিয়েছে, তা হলো–আমরা সবাই অনেক মানুষের মাঝে থাকি বটে, কিন্তু আমরা আসলে বিচ্ছিন্ন। আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাটা কিন্তু খুব মারাত্মক। কেন এটা ঘটে? কারণ যে কাজ করছি, তার ফল আমি পাচ্ছি না। পাচ্ছে আরেকজন। কাজটাকে তখন নিছক একটা কর্তব্য বলে মনে হয়। তাই সেই কাজের সাথে আমার কোনো সংযোগ গড়ে ওঠে না।

ক্রমাগত এভাবে চলতে থাকলে মানুষ একসময় নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। নিজেকে চিনতে পারে না। সমন্বিতভাবে কোনোকিছু চিন্তা করতে পারে না। নিজেকে তখন খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন মনে হয়। আর এ থেকেই সৃষ্টি হয় হতাশা ও আসক্তি। আসে উদ্যোগহীনতা। কেউ-বা বিভ্রান্ত হয়ে পা বাড়ায় মাদক বা এ ধরনের ভুল পথে। কেউ হয়ে ওঠে সহিংস।

আজ আমাদের পরিবারগুলো হয়ে পড়েছে এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সবচেয়ে নির্মম শিকার। ফলে কারো সাথে কারো সত্যিকার যোগাযোগটা আর হচ্ছে না। নতুন করে কোনো যোগাযোগ গড়েও উঠছে না। সে সুযোগও আর নেই ইদানীং। ইচ্ছে থাকলেও বাবা-মা সন্তানকে সময় দিতে পারছেন না। অর্থ উপার্জনের জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে উভয়কেই। সেইসাথে সন্তানকেও তারা ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছেন আরেকটি প্রতিযোগিতার দিকে–পরীক্ষায় ভালো করো। ভালো জীবিকার ব্যবস্থা করো। তা না হলে তুমি হেরে যাবে।

এই লাগামহীন প্রতিযোগিতার প্রধানতম কারণ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ মানুষের আশার সাথে শত্রুতা করছে। পুঁজিবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখাচ্ছে।

আমরা জানি, মানুষ বিকশিত হয় সামাজিকভাবে, সবার সাথে মিলেমিশে। সভ্যতার ক্রম-উত্তরণ এভাবেই ঘটে। অথচ পুঁজিবাদ বলে–তোমার উন্নয়ন শুধুই তোমার জন্যে। লেখাপড়া করে নিজে বড় হও, অন্যকে গাড়ি চাপা দাও। এটাই পুঁজিবাদের শিক্ষা।

এই যে আমরা আজ এত বলছি বিশ্বায়নের কথা, বিশ্বায়ন পুঁজিবাদেরই অন্য নাম। পুঁজিবাদ আর আন্তর্জাতিকতা এক নয়। আমরা আন্তর্জাতিকতা চাই, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা কখনোই নয়।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

অথচ পুঁজিবাদের মরণ-আগ্রাসনের ফলে পরিবারে, সমাজে, দেশে যে সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, তা ক্রমশ বাড়ছে। এতে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধগুলোও আজ ভীষণভাবে আক্রান্ত।

একটা সময় ছিল, যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানারকম অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের আনন্দময় ও কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। সিনেমাও এখন আর হলে গিয়ে দেখে না লোকজন, দেখে যার যার ঘরে বসে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ মানুষকে একাকী ও ক্ষুদ্র পরিসরে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে ক্রমশ ছোট করে ফেলা হচ্ছে সবাইকে।

এই ক্ষুদ্রতা চলে এসেছে সবখানেই। গ্রামেগঞ্জে আগে ছিল সমবায় পদ্ধতি, সবাই মিলে একত্রে কিছু একটা করা। সকলের জন্যে কল্যাণকর ও লাভজনক কোনো উদ্যোগ নেয়া। তার বদলে এখন জায়গা করে নিয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ। যারা ক্ষুদ্র ঋণ নিচ্ছে তারা কেউ কিন্তু কারো সাথে যুক্ত নয়, প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন। কেউ কারো সহযোগী নয়, বরং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

পুঁজিবাদ এভাবেই মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে। পরিণত করে একজন ভোগবাদী মানুষে এবং মুনাফালোভীতে। যার ফলে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে টাকা। পারস্পরিক যোগাযোগের কোনো মাধ্যমই এখন কার্যকর হচ্ছে না টাকা ছাড়া।

এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের জগতে 'সামাজিক যোগাযোগ' নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ। আমি একা ঘরে বসে লিখছি, গাইছি, সিনেমা দেখছি—এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় সবখানেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ চর্চা না থাকলে ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে তো বটেই, শিক্ষকদের সাথেও শিক্ষার্থীদের যোগাযোগটা হয়ে পড়ে শুধুই ক্লাসরুম-কেন্দ্রিক। তখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা সম্ভাবনা ওদের থাকে। অন্যদিকে খেলাধুলা বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্লাসরুমের বাইরেও ছাত্র-শিক্ষক সবার মাঝেই একটি সুন্দর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

আর এভাবেই পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে একটি চাঙ্গা প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলতে পারব বলে আমি মনে করি। শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থার

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বদল আমাদের করতেই হবে। এর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারব না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে সহিংসতা সৃষ্টি করছে। সর্বত্র বাড়িয়ে তুলছে সংঘর্ষ। মাদকের বিস্তার ও অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ধারণ করেছে এক ভয়াবহ রূপ। শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক প্রয়োজনীয় সবকিছুকেই পণ্যে পরিণত করেছে। হরণ করেছে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা। সেইসাথে বাড়ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য।

পুঁজিবাদের প্রভাবে কমে গেছে জ্ঞানের চর্চা। আমরা এখন কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যা ও দক্ষতা অর্জন করছি কেবল পেশাগত সুবিধা এবং ভালো উপার্জনের জন্যে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তো হওয়া চাই সর্বাঙ্গীণ, যা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই বিকশিত করবে। নতুন নতুন জ্ঞানের দরজা খুলে দেবে। যে জ্ঞান তাকে কোনো বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না, সে বেরিয়ে যাবে তার সকল বৃত্ত ভেঙে।

আমরা শিক্ষার কথা বলছি, এই শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার মাতৃভাষার চর্চাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সর্বাগ্রে দরকার। আমরা জাতীয়তাবাদের কথা বলি। জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাষা। ভাষাই জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি। যেমন : ইউরোপে রেনেসাঁ ঘটেছিল মাতৃভাষা চর্চার ফলে। এর মধ্য দিয়ে ওখানে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটল। পরবর্তীতে পৃথিবীব্যাপী তারা রাজত্ব কায়েম করল। ভাষাই ছিল এর অন্যতম নেপথ্য-নিয়ামক।

আবার, আরবরা ইরান দখল করে চারশ বছর শাসন করেছে। ইরানিরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু ওরা ওদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এটা করতে পেরেছে বলেই ইরান আজও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই ভাষার চর্চা প্রয়োজন। ব্যক্তি যদি ভাষা ব্যবহার করতে না পারে সে যেমন মূক-বধির হয়ে যায়, তেমনি জাতিও মূক হয়ে যায়–যদি সে তার ভাষা ব্যবহার করতে না পারে।

আর উপনিবেশের প্রধান আগ্রাসন হচ্ছে ভাষার প্রতি। অস্ত্র ব্যবহার করে কোনো অঞ্চল দখল করা যায় বটে, কিন্তু নিজেকে ওখানে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় হচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতি। কারণ ধর্মের সাহায্যে কাউকে সম্পূর্ণ অধীন করা না গেলেও এ দুয়ের সাহায্যে তা সহজেই পারা যায়।

ইংরেজরা কী করেছিল? ওরা এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিন্তু নানান কায়দাকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে এদেশ দখল করে নিল। তারা

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

তাদের ভাষাটাকে এখানে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, যেন এই দেশে তাদের অনুগত একটা শ্রেণি তৈরি হয়–যাদের চেহারা ও রক্ত এদেশীয় হলেও রুচি ও চিন্তাচেতনায় তারা হবে ইংরেজদের মতো।

বর্তমানে আমরা কিছু তরুণকে উন্মাদনা ও সহিংসতার দিকে ঝুঁকতে দেখছি, এটা কিন্তু ঘটছে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই। এক ধরনের বিভ্রান্তি ও আসক্তির বৃত্তে ওরা আটকে গেছে। পুঁজিবাদের প্রতি মোহও এর একটা কারণ। এরা মূলত পুঁজিবাদী মানসিকতার শিকার।

ধর্মের দুটি দিক আছে। নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বা বিভিন্ন ধর্মাচার পালনের আয়োজনই দেখা যায়। কিন্তু ধর্মের নৈতিক শিক্ষাগুলোও তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ–যা মানুষকে ভালবাসতে বলে, নিজের সদ্‌গুণগুলোকে বিকশিত করতে বলে, অন্যের কল্যাণে কাজ করতে বলে, কারো প্রতি অন্যায় না করার আহ্বান জানায়–এসবের কোনো অনুশীলন আমরা এখন কোথাও দেখি না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। অনৈতিকতার চর্চা বাড়ছে।

এ দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। এজন্যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাড়াতে হবে নৈতিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা। এর পাশাপাশি চাই সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। কারণ ব্যক্তি প্রধানত শক্তিহীন–যদি না সে যুক্ত হতে পারে সমষ্টির সাথে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আগস্ট ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।
'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা।
শিক্ষাবিদ, লেখক ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের
প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বের বৃহত্তম বইপড়া কর্মসূচির
সার্থক রূপকার।

event.quantummethod.org.bd

জীবনকে মহিমান্বিত করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে

আ ব দু ল্লা হ আ বু সা য়ী দ

এই অডিটোরিয়ামে ঢুকে যে এত মানুষ দেখব, এ আমি কল্পনাও করি নি। আগে যদি জানতাম তাহলে হয়তো আসতামই না। ও আমার দরদী, আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না। কাছাকাছি কয়েকটা অডিটোরিয়ামে আরো নাকি লোকজন আছে শুনলাম। ভাগ্য ভালো আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না। তা না হলে এতক্ষণে জবান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

যা-ই হোক, আমার আজ ঠিক অত কথা বলা উচিত না। কারণ যেদিন যার বই প্রকাশিত হয় সেদিন তার অবস্থা থাকে আমাদের সময়কার বিয়ের আসরের জামাইয়ের মতো। আমার মনে আছে, অকারণেই একটা রুমাল দিয়ে সেদিন মুখখানা ঢেকে রেখেছিলাম। তেমনি যার বই প্রকাশিত হচ্ছে, সে আবার কথা বলবে কেন? কিংবা ধরুন, বিয়ের আসরে কনে যদি হঠাৎ গান গাইতে শুরু করে! আজকাল আবার দেখি গায়ও। *দেবদাস* ফিল্মের মধ্যে দেখি পার্বতীও নাচে, তার শাশুড়িও নাচে। সবাই একসঙ্গে মিলে সে কী তুমুল নাচগান!

এবার আসল কথায় আসি। প্রথমেই বলি, জামিলুর রেজা চৌধুরী আমার এই বইয়ের বিক্রির সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বইটা বুঝতে তার সময় লাগবে। আমার মনে হয় বইটা না কেনার পক্ষে পাঠকের জন্যে এ কথাটাই যথেষ্ট যে, ‘আপনারা ভাই এ বই কিনবেন না। কিনলেও বুঝবেন না। আমি যখন বুঝি নি তখন কি আর

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আপনারা বুঝতে পারবেন?' কথা তো সত্যিই। বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার যা বুঝতে পারছেন না, অন্যের কী স্পর্ধা সেটা বোঝে! কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি ভাই–আমার ভাষা খুব সোজা। বক্তব্য অতি সরল। আমার মনে হয় আপনাদের অত অসুবিধা হবে না, হলে পরে জামিলুর রেজা চৌধুরী সাহেবের কাছে যাবেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে।

জামিলুর রেজা চৌধুরী আসলে খুবই অসাধারণ একজন মানুষ। অনেক দেরিতে তাকে বই উৎসর্গ করেছি আমি। সে-কারণে আমি কিছুটা লজ্জিত এবং সংকুচিত বোধ করছি। এটা আরো অনেক আগেই করা উচিত ছিল আমার। কেন বলছি কথাটা?

আপনারা জানেন, লক্ষ লক্ষ লোক আজকে বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। বহু মানুষ যাচ্ছে চিরদিনের জন্যে। আর হয়তো ফিরে আসবে না। কিন্তু আমার ধারণা–কোনো মানুষের মধ্যে যদি আলো থাকে, শক্তি থাকে, প্রতিভা থাকে তাহলে তিনি সাধারণত কখনোই দেশত্যাগ করেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশেই ফিরে আসেন।

এমন বিস্তর নাম বলা যাবে, যারা দেশে ফিরে এসে আজ আমাদের জাতিকে গড়ে তুলছেন। তারা বিদেশে গিয়েছিলেন উচ্চতর পড়াশোনা বা পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর কাজে। কিন্তু একসময় ঠিক টের পেয়েছিলেন–তার আত্মার আনন্দ ও তার জীবনের প্রকৃত যে পরিচয়, সেটা আছে কেবল তার মাতৃভূমিতে। বিদেশে এটা হয় না। ওখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বড় কাজ করা খুবই কঠিন।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বিদেশে ভালোভাবে থেকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক উচ্চতর সাফল্যও তিনি সেখানে অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান করে এই গরিব দেশটাকে তিনি ভালবেসেছেন। এদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ক্লান্তিহীন চেষ্টা করেছেন। শ্রম দিয়েছেন। আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সবার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ একদিন অনেক বড় হবে। অনেক বড় বড় মানুষেরা আসবেন। আজকে ঢাকা শহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে একেকজনের নামে। এই দেশে কি আর বড় মানুষ জন্মাবে না এদের চাইতে? যদি শেক্সপিয়ারের মতো একজন মানুষ আসেন, যদি প্লেটোর মতো একজন মানুষ জন্মে যান, তাকে কোন রাস্তা দেবেন

event.quantummethod.org.bd

আপনারা? একটা জাতির সবচেয়ে বড় রাস্তা কি আরো বড় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছে না?

আমার অনেক সময় মনে হয়–এটা কেন করলাম আমরা? কারণ আমরা হয়তো ধরেই নিচ্ছি যে, এখানেই বাংলাদেশের শেষ। কিন্তু তা-তো নয়, বাংলাদেশ আরম্ভ হচ্ছে। মোটে জাগতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ এগোবে। বাংলাদেশ বড় হবে। বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশ হবে একদিন। এটা আমি নিজে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের জাতির মধ্যে মেধা আছে এবং বহু মানুষ আছে যাদের মধ্যে অফুরান কর্মোদ্যম রয়েছে। এ জাতিকে অনেক অনেক ওপরে নিয়ে যাবে তারা।

এজন্যে এখন যা দরকার আমাদের, সেটা হলো, কাজ করে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত কাজটাই মানুষকে জয়ী করে। কাজ হলো অথৈ সমুদ্রে একটা শক্তপোক্ত ভেলার মতো, যা মানুষকে ভাসিয়ে রাখে। কাজ না করলে মানুষ ডুবে যায়। সময়ের সমুদ্রে হারিয়ে যায়।

গ্রামের দিকে একটা কথা প্রচলিত আছে–'ভিক্ষুকের পায়ে লক্ষ্মী'। অর্থাৎ ভিক্ষা পেতে হলে হাঁটতে হয় এবং যে যত হাঁটবে তার প্রাপ্তি তত বেশি হবে। এটা একেবারে সহজ হিসাব। সুতরাং কোনোভাবেই বসে থাকা নয়। বসে থেকে নিঃশব্দে নিজের ভেতরে শেষ হয়ে যাওয়ার কোনোরকম সুযোগ জীবনে নেই। চিরদিন বাঁচব না আমরা কেউই, কিন্তু যে কয়দিন আছি এই পৃথিবীতে–আমরা যেন কাজ করে যেতে পারি।

দিনকয় আগে আমাকে একটা অনুষ্ঠানে একজন বললেন যে, একদিন তো আমরা মরে যাব। আমি তখন বললাম, মরে যাব ঠিক আছে কিন্তু এখন কি বেঁচে আছি? যদি বেঁচেই থাকি তাহলে করণীয় কী আমার?

আমার একটাই কর্তব্য–এই জীবনকে তার সর্বোচ্চ মহিমা দান করা। আমাদের সেটা পারতে হবে। তাহলেই আমরা অশান্তির হাত থেকে বাঁচব। দুঃখের হাত থেকে বাঁচব। হতাশার আক্রমণ থেকে বাঁচব। নৈরাশ্যের কবল থেকে বাঁচব। একটা আনন্দময় জীবন পার করে এই পৃথিবী থেকে চলে যাব। সেটাই তো আমাদের সবার কাম্য।

আমি সবসময় বলি, আমাদের অনেক দুঃখের মূল কারণটা হচ্ছে আশা হারিয়ে ফেলা। তাই আশাটা যেন আমাদের সবসময় থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, নৈরাশ্য বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নেই।

ধরা যাক, একটা গাড়ি পাহাড় বেয়ে উঠছে ওপরের দিকে। আপনি কী

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বলবেন? গাড়িটা উঠছে। ওপরে যাচ্ছে অর্থাৎ উত্থান হচ্ছে। কিন্তু গাড়িটা যখন আবার পাহাড়টা পার হয়ে নিচের দিকে নামে তখন কি আপনি বলতে পারবেন যে, ওর পতন হচ্ছে? না, কখনোই তা নয়, এটা কিছুতেই আপনি বলতে পারবেন না। কেন?

কারণ গাড়িটা নিচের দিকে নামলেও ওর চাকাটা কোন দিকে যাচ্ছে? সামনের দিকে না পেছন দিকে? সামনের দিকে। তাহলে তো এগোচ্ছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমরা নৈরাশ্য বলে মনে করছি অর্থাৎ পতন মনে করছি, সেটা তো আসলে সামনের আরেকটা পাহাড়ে উঠবে বলে। সেটা তো তাহলে উত্থান।

সুতরাং আমরা চিরদিন আসলে উত্থানের মধ্যেই আছি। পতন বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। হতাশা বা নৈরাশ্য বলে কিছু নেই। এগুলো আমাদের মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা দিয়ে তৈরি। দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, কষ্টও আছে কিন্তু সেগুলোই শেষ কথা নয়। ওটা সাময়িক। একে অতিক্রম করতে হবে। সেই গাড়ির মতোই আমাদের উঠতে হবে। নামতেও হবে। কারণ নামাটাও আসলে এক ধরনের ওঠা। পরবর্তী পাহাড়ে সে উঠতে যাচ্ছে। জীবনকে আমাদের দেখতে হবে এই দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ তো এজন্যই তার গানে বলেছেন–

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ–
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥

আমি আশাবাদে বিশ্বাস করি। তার মানে এই না যে, মাঝেমধ্যে একটু কুঁইকাঁই করি না। এটা সবারই হবে। আমি যত বড় আশাবাদীই হই, আমাকে যদি কেউ ভীষণভাবে আঘাত করে, আমার অজান্তেই আমার ভেতর থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেই আর্তনাদই শেষ কথা নয়। ওটাই চূড়ান্ত সত্য নয়। আমাদের গন্তব্য হচ্ছে আরো অনেক দূরে। অনেক সামনে।

event.quantummethod.org.bd

আমাদের জীবন আসলে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে আমাদের শ্রমের মধ্য দিয়ে, আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে, আমাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

তাই আমি সবাইকে বলব যে, নৈরাশ্যে বিশ্বাস করবেন না। নৈরাশ্য নেই এ পৃথিবীতে। নৈরাশ্য হচ্ছে একটা বিভ্রম, একটা মায়া ও মরীচিকা– যেটা আমি প্রায়ই বলি। এর কোনো অস্তিত্বই নেই। আমরা যাকে নৈরাশ্য বলি, সেটা হচ্ছে আশারই একটা অন্য রূপ মাত্র। সুতরাং আসুন, আমরা সবাই আশা করি। আমরা সবাই বিশ্বাস করি–He who liveth, he who believeth, shall never die.

'ভাঙো দুর্দশার চক্র' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব
২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

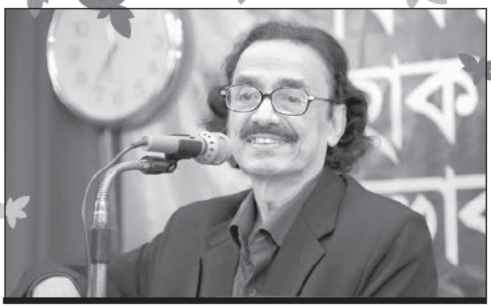

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনতত্ত্বের খ্যাতিমান
অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।
বাংলা ভাষায় দর্শন পাঠ ও চর্চাকে সাধারণ্যে
জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এদেশে তিনি একজন
পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন সময়ে তিনি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান,
কলা অনুষদের ডীন, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা
কেন্দ্রের পরিচালক ও বাংলাদেশ দর্শন সমিতির
সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

event.quantummethod.org.bd

মনুষ্যত্বের কাছে পাশবিকতা হার মানবেই

আ মি নু ল ই স লা ম

আমি তখন বিলেতে। একদিন শুনলাম, সে-দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রে যারা কাজ করে প্রতিদিন কর্মস্থলে ঢোকার সময় ওদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বেরোবার সময়ও পুনরায় চেক-আপ করে দেখা হয়। কারণ কোনো কারণে হঠাৎ যদি সে ভুল করে একটা টিপ দিয়ে বসে, সারা পৃথিবী মুহূর্তেই শেষ! কিন্তু এভাবে পরীক্ষা করে কয়দিন? সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে তো যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান যুগ নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করি। মানুষ মহাকাশে চলে যাচ্ছে, তার জীবনযাত্রার মান ও শক্তি-সম্পদ অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু ধন জ্ঞান জন, এ-ই কি সব? পাল্লা দিয়ে যে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ-কালে আমাদের অর্জন অনেক—এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ ও বিবর্তনকে আজ ম্লান করে দিচ্ছে মানুষেরই নেতিবাচক দিক।

এসব দেখে ম্যাক্সিম গোর্কি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হায় রে মানুষ! তুমি কী বিচিত্র! তুমি পাখির মতো আকাশে উড়তে শিখেছ, মাছের মতো পানিতে সাঁতার কাটতে শিখেছ! কিন্তু মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস করার যোগ্যতা তুমি এখনো অর্জন করলে না!' কবি হাসান হাফিজুর রহমান বলেছিলেন, 'এ যুগে আমাদের অর্জন যত বেশি হোক না কেন, এখন আর

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা নেই।' আর স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মানুষ যদি মানুষের ওপর আস্থা হারায় তাহলে আর নির্ভর করার কিছু থাকে না।'

অর্থাৎ এ যুগের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত নয়, মূল্যবোধ-সংক্রান্ত। ১০ লক্ষ বছর আগে মানুষ পশুর মতো কাঁচা মাংস খেত, অন্যের ওপর দৌরাত্ম্য করত। ব্রিটিশ দার্শনিক হব্‌স-এর মতে, 'ঐ সময়ের জীবন ছিল বিচ্ছিন্ন। সামাজিক বন্ধন, পরিবার, রাষ্ট্র–এই ধারণাগুলো ছিল না। মানুষ বিশ্বাস করত, প্রকৃতিতে যা-কিছু আছে সব আমার। তার একমাত্র প্রবৃত্তি ছিল নিজের অবস্থানটা কী করে পোক্ত করা যায়।'

সেকালের প্রেক্ষাপটে এটা হয়তো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে যখন সব বাধা পেরিয়ে আমরা মঙ্গল গ্রহে সুপেয় পানি খুঁজছি–সেই সময় আশুলিয়া থেকে বুড়িগঙ্গা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া–সবখানে দূষণ। ওষুধ খেতেও ভয় লাগে। মানুষের এ অবক্ষয়ের কারণ কী? বিপুল বিত্তের মধ্যে থেকেও চিত্তের এ মহা শূন্যতা কেন?

কারণ নৈতিকতার চেয়ে এখন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তি। তাই মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত–নিজের সাথে, সঙ্গীদের সাথে। পরিবেশের সাথেও! প্রশ্ন হলো, এত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন যুদ্ধ করে?

১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আক্ষেপ করে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডকে লিখেছিলেন, 'নিজেদের যারা শিক্ষিত সুসভ্য বলে দাবি করে, তারা কী করে সংকীর্ণ স্বার্থের দোহাই দিয়ে ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি থেকে শুরু করে মহাযুদ্ধ পর্যন্ত করার ইন্ধন জোগায়?' উত্তরে ফ্রয়েড লেখেন, 'মোটাদাগে কাউকে ভালো বা মন্দ বলা যাবে না। সব মানুষের মধ্যেই ঝগড়াটে স্বভাব ও সৌহার্দ্যবোধ সমভাবে ক্রিয়াশীল। এ দুটো বিপরীত শক্তির চলমান লড়াইয়ে মানুষ যদি কোনো কারণে তার আগ্রাসী মনোভাবের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, তখনই আরম্ভ হয় বিবাদ। মানুষের সৌহার্দ্যবোধকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাই প্রয়োজন সুশিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ'।

শিক্ষা মানুষেরই দরকার। কারণ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। একটা গরুর বাচ্চা জন্মের পর পরই লেজ উঁচিয়ে লাফাতে থাকে। আবার যে মানবশিশু জন্মের পর সবচেয়ে অসহায় প্রাণী, সে-ই একসময় হয়ে উঠতে পারে বিশ্বখ্যাত কেউ। আবার ঠিকপথে পরিচালিত না হলে সে হয় কুখ্যাত অপরাধী। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যে সুশিক্ষার পথে এগিয়ে গেলে নর হতে পারে নারায়ণ। উল্টোপথে চললে নরাধম।

event.quantummethod.org.bd

কিন্তু শিক্ষা মানে কি কেবল প্রশিক্ষণ? একজন সার্জন মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ শিশুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, আবার রোগীকে মেরেও ফেলতে পারেন। তাই শিক্ষা শুধু কিছু জানা বা আয়ত্ত করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য 'মানুষ' তৈরি করা। শিক্ষাই জৈবিক ব্যক্তিকে নৈতিক মানুষে রূপান্তরিত করে। সত্যিকার শিক্ষার মধ্যে চাই কিছু মূল্যবোধ। প্রথমত, সত্যনিষ্ঠা। সত্যের জন্যে সবকিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনোকিছুর জন্যেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্যবোধ। তৃতীয়ত, কল্যাণচেতনা। সত্য সুন্দর কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানুষ কখনো মন্দ কাজ করতে পারে না।

বাইবেলে আছে, 'ঈশ্বরের রাজত্ব বাইরে নয়! তোমার মধ্যেই তা আছে, সেই রাজ্যে প্রবেশ করার উপায় হলো নিজেকে ও পরিবেশকে পরিবর্তন করার নিষ্ঠা ও সংকল্প'। এজন্যে চাই সৎ, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ। এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় লেখা ছিল—এই প্রতিষ্ঠান শুধু জ্ঞান বিতরণের জন্যে স্থাপন করা হচ্ছে না। নেতৃত্বগুণসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার সময় এখনো শেষ হয়ে যায় নি। অতীতের ভুলগুলো সংশোধন করে নতুনভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

অনেকে বলে, বাংলাদেশ গেল গেল গেল। কিন্তু আমি হতাশাবাদী নই। এই দেশ বারো ভূঁইয়ার দেশ, যারা মোঘল সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে দফায় দফায় আন্দোলন করে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। সেই প্রেরণা এখনো আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। আমাদের তরুণেরা আজ সারা পৃথিবীতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

কাজেই পরিস্থিতি যেমনই হোক, হতাশ হলে চলবে না। মনুষ্যত্বের কাছে পাশবিকতা শেষ পর্যন্ত হার মানবেই। তাই অপশক্তির মোকাবেলা করতে হবে সাধ্যমতো। সংহত করতে হবে আমাদের নৈতিক-মানবিক আদর্শ। তাহলেই বিশ্ব এগিয়ে যাবে নৈতিক প্রগতির পথে।

এজন্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমমর্মিতা বাড়াতে হবে। দল-মত-পথ নির্বিশেষে একসাথে কাজ করতে হবে। মানুষের মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও খুঁজে নিতে হবে ভেদের মধ্যে অভেদ, অনাত্মীয়তার মধ্যে আত্মীয়তা। এভাবেই সারা পৃথিবী ক্রমান্বয়ে শান্তির দিকে অগ্রসর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মুক্ত আলোচনা, ২ জানুয়ারি ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।
বরেণ্য ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইতিহাস বিভাগের সুপারনিউমেরারি অধ্যাপক।
বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক।

event.quantummethod.org.bd

মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯১১ সাল। ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লি এলেন বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে। ভারতীয় নেতা গোখলে-কে তিনি প্রশ্ন করলেন–আমরা তোমাদের রেলপথ-রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হচ্ছো, তবু স্বাধীনতা চাও কেন? কালবিলম্ব না করে গোখলে উত্তর দিয়েছিলেন–আমাদের আত্মমর্যাদা আছে বলেই স্বাধীন হতে চাই।

বাঙালিরাও বার বার স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, আত্মমর্যাদা আছে বলে। আসলে স্বাধীনতা মানে সমৃদ্ধি। স্বাধীন না হলে মানব-অস্তিত্বের বিকাশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যত প্রতিরোধ হয়েছে, তার সিংহভাগই ঘটে বাংলা অঞ্চলে। সুপ্রকাশ রায় রচিত *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* বই-এ আছে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ২০০টিরও বেশি প্রতিরোধ আন্দোলন করেছে। তাই স্বাধীনতার অন্বেষাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অন্য নাম।

পশ্চিমারা দাবি করে, গণতন্ত্রের সূচনা প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। অথচ ইতিহাস বলে, তারও একশ বছর আগে বাংলায় গণতন্ত্রের শেকড় ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই অঞ্চলে ছোট ছোট গণরাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজ্যে একটি পরিষদ থাকত, যারা রাজা নির্বাচন করতেন। যতদিন রাজার প্রতি ঐ পরিষদ আস্থা রাখত রাজা ততদিনই ক্ষমতায় থাকতেন। পরিষদ আস্থা হারালে রাজা বিদায়।

গণতন্ত্রের এই চর্চা দেখা যায় রাজা গোপালের সময়েও। বাংলার প্রথম

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক লোকান্তরিত হওয়ার পর এদেশে শুরু হয় মাৎস্যন্যায় যুগ। এ অরাজক সময়ে আইনশৃঙ্খলা কিছুই ছিল না। সংশয়-শঙ্কার মধ্য দিয়েই কাটছিল সাধারণ মানুষের জীবন। তারপর ৭৫০ সালের দিকে নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। তাদের বলা হতো প্রকৃতিপুঞ্জ। এখনকার ভাষায় সুশীল সমাজ। এই প্রকৃতিপুঞ্জ ক্ষত্রিয় গোপালকে বাংলার রাজা মনোনীত করলেন। তবে তারা শর্ত দিলেন—সুশাসন দিতে না পারলে তোমার রাজত্ব থাকবে না।

বিদেশি পণ্ডিত অধ্যাপকরা ইদানীং এসে ওয়াজ-নসিহত করে যায়—তোমাদের দেশে সুশাসন নেই। অথচ পশ্চিমা দুনিয়াতে সিভিল সোসাইটি বা সুশাসনের ধারণা যখন জন্মই নেয় নি, তখন মুক্ত গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশে! গোপালের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলা ঘুরে দাঁড়াল। সারা ভারতবর্ষে বাংলা রাজ্যটি হয়ে উঠল সম্মানিত ও শক্তিশালী। ১১৬১ সাল পর্যন্ত বংশপরম্পরায় পালদের শাসন চলল জনগণের সম্মতি সাপেক্ষেই। এটা বাংলার স্বর্ণযুগ।

পালরা ছিল এ মাটিরই সন্তান। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সিংহভাগ হিন্দু প্রজার ওপর তারা রাজধর্ম চাপিয়ে দেয় নি। বরং প্রজাদের জন্যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সময়েই রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদ*। একসময় পালরা দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা দখল করে নিল দক্ষিণ ভারত থেকে আসা কট্টর ব্রাহ্মণ সেন রাজারা। তারা দেখল, এদেশের হিন্দুরা অনেকটা শিথিল, অতএব এদের ভালো হিন্দু বানাতে হবে। ১৯৭১-এ পাকিস্তানিরা যেমন আমাদের ভালো মুসলমান বানাতে চেয়েছিল, তেমনি এক অপচেষ্টা!

শূদ্রদের ওপর শুরু হলো দারুণ সামাজিক পীড়ন। সেন রাজারা বাংলার ইতিহাসে প্রথম ফতোয়া দিল—নমশূদ্ররা পরকালে রৌরব নরকে যাবে। আর ব্রাহ্মণদের *ভগ্‌বদগীতা* পাঠ ওরা শুনে ফেললে ওদের কানে ঢেলে দেয়া হবে গরম সীসা। এভাবে সেন রাজারাই বাংলায় জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে। ফলে শাসক আর শাসিতের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলো। এ সুযোগে মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে সহজেই রাজ্য দখল করে নেয়।

শুরু হলো সুলতানি আমল। টানা দুশো বছর বাংলা দিল্লির কোনো অধীনতা মানে নি এবং বাংলার সম্পদ বাইরে যায় নি। এ এক বিরাট অর্জন! ১৩৪২ সালে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দুই বাংলাকে একত্রিত করে

event.quantummethod.org.bd

উপাধি নেন শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান। 'বাংলা' ও 'বাঙালি' শব্দ দুটিকে সম্মানজনক করে তোলার জন্যে আমরা তার কাছে ঋণী।

তবে আরো বড় কাজ করেছেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ। তিনি দেখলেন, দিল্লির তুলনায় বাংলা অনেক ছোট রাজ্য। দিল্লির প্রভাব ঠেকাতে নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি, যার জন্যে তাকে বলা যেতে পারে আধুনিক যুগে স্মল স্টেট ডিপ্লোমেসির জনক। তিনি চীন ও পারস্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করলেন। চীনের সঙ্গে করলেন রাজনৈতিক কূটনীতি। আমাদের রাজদূতরা চীনে যেত, চীনের দূতরা বাংলাদেশে আসত। অথচ ইউরোপে তখনো রাষ্ট্রদূত বিনিময় প্রথার প্রচলনই হয় নি।

চীনা দূতরা দেশে ফিরে গিয়ে অনেকেই আত্মকথা লিখেছেন। এর কিছু ইংরেজি অনুবাদ আমি লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, চীনারা বাঙালিদের দুটো সার্টিফিকেট দিয়েছে—বাঙালিরা মিথ্যা বলে না এবং কারো সাথে প্রতারণা করে না।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানান। এর মধ্য দিয়ে পারস্যের সঙ্গে তিনি সূত্রপাত করলেন সাংস্কৃতিক কূটনীতির। মক্কা-মদিনায় সূত্রপাত করলেন ধর্মীয় কূটনীতির। বাংলার অর্থে তৎকালীন আরবের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে নির্মাণ করে দিলেন অসংখ্য মাদ্রাসা, যেগুলো পরিচিত ছিল গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে। পাশাপাশি ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রাও আরবে পাঠিয়ে দিলেন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্যে। আর সংস্কার করে দিলেন মজে যাওয়া জলাধার 'নহরে জুবাইদা'। এখন সৌদিদের সাথে দেখা হলে আমি বলি, তোমরা আমাদের মিসকিন বলো। তোমরাই একসময় মিসকিন ছিলে। আমাদের টাকায় তোমাদের দেশে মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে।

বাংলার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু এটা যেভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল, তা আজও হয় নি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ—সত্য ইতিহাস জানার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্যে। কোয়ান্টাম যে ইতিবাচকতার কথা বলে তা অনুসরণ করলে আমাদের জীবন ও সমাজ অনেক স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি সত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধি আমাদেরকে পরিণত করবে এক মহান জাতিতে।

মুক্ত আলোচনা, ১৭ জুলাই ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

ড. এ কে আব্দুল মোমেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।
জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি
ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ
কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।

event.quantummethod.org.bd

আমাদের দেশ হবে বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত

এ কে আব্দুল মোমেন

একটি ঘটনা বলি। আমার ভাইঝির বয়স তখন ১৮ বছর, লিউকেমিয়া ধরা পড়ল তার। সে রক্তশূন্যতায় ভুগছিল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু করলেও পরবর্তীতে এটা ব্লাড-ক্যান্সারে রূপ নিল। যার একমাত্র উপায় বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট (অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন)। তখন বোনম্যারো ডোনার পাওয়া এতটা সহজ ছিল না।

সপরিবারে তারা আমেরিকায় থাকত। অনেক চেষ্টার পর টেক্সাসের একটি বোনম্যারো ব্যাংকে তার সাথে মিলছে এমন বোনম্যারোর সন্ধান পাওয়া গেল। তার অপারেশনও হলো। অথচ আমরা তখনো জানতাম না– এটা কে ডোনেট করেছেন। তিন বছর পর তার পরিচয় জানতে পারি, তিনি ছিলেন একজন হিন্দু যুবক।

অপারেশনের পর আমার ভাইঝির কেমোথেরাপি চলছিল। বিভিন্ন রকম ওষুধও খেতে হতো তাকে। এসব কারণে তার কিডনি দুটি অকেজো হয়ে গেল। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছিল। কিডনি প্রতিস্থাপন করার জন্যেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোনো উপায় না পেয়ে সে নিজেই বিভিন্ন জায়গায় ই-মেইল করে জানাল, আমার জীবন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, কেউ কি একটি কিডনি ডোনেট করবেন?

কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটির থেকে পাঁচ বছরের ছোট একটি ছেলে ই-মেইলের জবাব দেয়। এই ছেলেটি ছিল আফ্রো-আমেরিকান খ্রিষ্টান পরিবারের সদস্য। তার বাবা নেই, মা গীর্জায় ধর্মীয় সঙ্গীত গেয়ে জীবিকা

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

অর্জন করেন। সে-ও গীর্জায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে। এতে তার পড়াশোনার খরচটা হয়ে যায়। এই ছেলেটিই তার কিডনি দান করতে রাজি হয় এবং স্রষ্টার করুণায় সফলভাবে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। আমার ভাইঝি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রথমে ক্যান্সার, পরবর্তীতে কিডনি প্রতিস্থাপন–এ দীর্ঘ চিকিৎসায় তার যে স্বাস্থ্যহানি হয়েছিল, তা-ও পুরোপুরি সেরে যায়। পরবর্তীতে আমার ভাইঝি এমবিএ করে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। বর্তমানে কাজ করছে নিউইয়র্কের একটি ক্যান্সার হাসপাতালের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হিসেবে।

ভেবে দেখুন, অচেনা-অজানা একজন মুসলিম মেয়েকে সনাতন যুবকটি বোনম্যারো ডোনেট করে এবং একজন খ্রিষ্টান ছেলে কিডনি দিয়ে সাহায্য করে। এতে প্রমাণ হয় যে, মানবিকতার স্থান ধর্মবর্ণের অনেক ওপরে।

আমি খুবই আনন্দিত, স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননার এ অনুষ্ঠানে আপনারা যারা রক্তদাতা এখানে আছেন, তারা নিঃস্বার্থভাবেই রক্ত দিচ্ছেন। আপনার রক্ত কে পাবে বা কোন গোত্রের লোক পাবে, সেটা আপনারা দেখেন না। এখানে এসে আমি মুগ্ধ হয়েছি যে, আমাদের দেশে এতজন মানুষ মানবসেবায় নিয়োজিত আছেন। আপনারা সত্যিকার অর্থেই আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার প্রচেষ্টায় আছেন। আমি খুবই আপ্লুত।

কোয়ান্টামের কোনো অনুষ্ঠানে এর আগে আমার আসা হয় নি। কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয় অতিসাম্প্রতিক। অনেক ভালো কাজের পাশাপাশি আপনারা রক্তদানের মাধ্যমে মানুষকে সেবাদান করছেন। মানুষকে উজ্জীবিত রাখছেন। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বে যুদ্ধ-সংঘাত, সন্ত্রাস, মারামারি-কাটাকাটি লেগেই আছে। যার ফলে লোকজন কর্মক্ষেত্র, বসতবাড়ি, নিজেদের ঐতিহ্য থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। শরণার্থী হয়ে বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত হচ্ছে। এবছর (২০১৭) বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ শরণার্থী হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত অল্প সময়ে ছয় কোটির বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয় নি। আমরাও একসময় শরণার্থী হয়েছিলাম, সেই ১৯৭১ সালে। বাধ্য হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তবে আমাদের আশা ছিল, আমরা ফিরে আসব। ইদানীং যারা শরণার্থী হচ্ছে, তাদের অনেকের সে আশাটাও নেই।

পৃথিবীব্যাপী এ সংঘাতের মূল কারণ হচ্ছে অন্ধত্ব, অজ্ঞতা। পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি বেড়েছে অন্যের প্রতি সম্মানবোধের

event.quantummethod.org.bd

অভাব। এই হত্যাযজ্ঞ ও সংঘাত থেকে পৃথিবীকে সুন্দর করতে চাইলে আমাদের সহিষ্ণু মনোভাব গড়তে হবে। সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। সব মানুষই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি–সবকিছুর উর্ধ্বে চাই এই মন-মানসিকতা, এই বিশ্বাসেই যেন আমরা বিশ্বাসী হই।

বাংলাদেশকেই এ-ক্ষেত্রে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়া উচিত। কারণ আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় ১৪৯২ সালে। ইউরোপের রেনেসাঁ শুরু হয় ১৭শ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু তার বহু আগে, ইউরোপে রেনেসাঁরও প্রায় ছয়শ বছর আগে, বাংলার কবি চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন–*সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই*। মানবিকতার জয়গান গাওয়া হয়েছে এদেশের সর্বত্রই। কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন : *গাহি সাম্যের গান–/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান*। এজন্যেই আমাদের দেশ একদিন হবে সারা বিশ্বে শান্তি, সংস্কৃতি ও মানবতার অগ্রদূত।

এই মানবিক বিষয়গুলো আমরা স্কুল-কলেজ এবং বাড়িতে শিখেছি। আমাদেরই এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। শান্তি, সংস্কৃতি ও মানবিকতার এই আন্দোলন আবারো আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এটা সরকারের বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি আপনাদের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাই। কারণ আপনাদের যে ধরনের মন-মানসিকতা তাতে মনে হয়, কোয়ান্টামের মতো প্রতিষ্ঠানকেই এ-কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

রক্তদাতা সম্মাননার অনুষ্ঠান
৬ আগস্ট ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

আবুল মোমেন।
শিক্ষাবিদ, লেখক ও কলামিস্ট।
আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চট্টগ্রামে
পরিচালিত শিশু-বিদ্যাপীঠ 'ফুলকি'র
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

event.quantummethod.org.bd

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

আমাদের দেশে শিশুরা আজ সবচেয়ে বঞ্চিত। সেটা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। গরিবের শিশু যেমন বঞ্চিত, ধনীর শিশুও বঞ্চিত। বঞ্চিত এই অর্থে যে, আমরা ধরেই নিয়েছি ভালো জামা-কাপড়, ভালো খাবার এগুলোই হচ্ছে শিশুর চাহিদা। এর বাইরে আমরা বেশি কিছু ভাবি না।

কিন্তু বাইরে হয়তো রোদ উঠেছে, শিশুর ইচ্ছে করবে মাঠে গিয়ে দৌড়াতে, গাছে উঠতে। তার লাফ দিতে ইচ্ছা হয়, পুকুরে সাঁতার কাটার ইচ্ছা হয়। শৈশবে এমন ক্ষুধার কোনো শেষ নেই। তার যেমন চিংড়ি মাছ খাওয়ার ক্ষুধা আছে, তেমনি রয়েছে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার ইচ্ছা তার আরো বেশি। কিন্তু শিশুর এই ইচ্ছাগুলো অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

আমরা সাধারণভাবে যে ধরনের ঘরবাড়িতে থাকছি, এই ফ্ল্যাটবাড়িগুলো হচ্ছে খাঁচার মতো। দরজাটা একবার লাগিয়ে দিলে পুরো দুনিয়া থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এটা শিশুর মনে বন্দিত্বের বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি করে।

আমি সৌভাগ্যবান যে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ছাত্রদের পড়িয়েছি। একবার ক্লাস ফোরের বাচ্চাদের সাথে আমরা একটা মুক্ত আলোচনা করলাম–মানুষ আসলে ইনডোর প্রাণি না আউটডোর প্রাণি। সেখানে অনেক তর্কবিতর্ক করল শিশুরা। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল–মানুষ আসলে আউটডোর প্রাণী। ভুল করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা অনেক আগে বলেছিলেন, শিশুকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। এমনভাবে ছাড়া উচিত যাতে তার গায়ে ধুলোবালি লাগে, বৃষ্টি জলে সে যেন একটু ভেজে।

শিশু আলাদা থাকতে চায় না। সে চায় মানুষের সংস্পর্শ। আপনি যদি তাকে সবার থেকে আলাদা করে রাখেন যে, সাফ-সুতরা থাকবে, পরিষ্কার থাকবে–তাহলে শিশুর যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, এটা থেকে সে বঞ্চিত হবে। নিরাপত্তার কথা ভেবে সবসময় আগলে রাখাটা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো নয়। তাকে তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। বন্ধুদের সাথে সে গলাগলি করবে, ঝুলাঝুলি করবে, ধাক্কাধাক্কি করবে, ফুটবল খেলবে। এ স্বাধীনতাটুকু তাকে দিতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর তিন ধরনের বিকাশ প্রয়োজন হয়। একটা হচ্ছে শারীরিক, একটা মানসিক, আরেকটা হচ্ছে আবেগিক বিকাশ। শরীরের বিকাশটা আমরা দেখতে পাই–খাওয়াদাওয়া করছে, আকারেও বাড়ছে। আবার শিশুকে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মনে করছি, লেখাপড়া করলেই সব হয়ে যাবে। ফলে এখন আরেকটি জিনিসের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তা হলো, অনেক অনেক পরীক্ষা। এখন আর কেউ শিক্ষার্থী নেই, সকলেই পরীক্ষার্থী। আমি মনে করি, এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খুব ক্ষতি হচ্ছে।

কারণ প্রাথমিক থেকে অষ্টম-নবম শ্রেণি পর্যন্ত জীবনটা হচ্ছে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার সময়। সে চতুর্দিক থেকে সংগ্রহ করবে। তার কাছে তো আমি তখন ফল চাইতে পারি না।

অথচ এখন অভিভাবকরা ক্লাস ওয়ান থেকেই সন্তানকে জিপিএ ফাইভের জন্যে তৈরি করছেন। এর ফলটা দাঁড়িয়েছে স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারের মূল্য বেড়ে গেছে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে এখন দাম বেশি গাইড বইয়ের। শিক্ষকের চেয়ে হাউজ টিউটরের দাম বেশি। শিক্ষার চেয়ে বেশি দাম পরীক্ষার। উল্টো যাত্রা হয়ে গেল সব!

আপনি যখন জীবনে প্রবেশ করবেন, তখন কি কেউ জানতে চাইবে–আপনি গণিতে কত নম্বর পেয়েছেন? ইংরেজিতে কত নম্বর পেয়েছেন? এটা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। জীবনের আসল চাহিদা হচ্ছে আপনার বিবেচনা বোধ কেমন–আপনি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আপনার মধ্যে বিচক্ষণতা, সেবাপরায়ণতা, মানবিকতা, বন্ধুপ্রীতি আছে কিনা।

event.quantummethod.org.bd

জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন কিনা। আপনি কঠিন সময়ে ভেঙে পড়েন, নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন?

জীবন আপনাকে এসব চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আর স্কুল বলছে, শুধু পরীক্ষায় পাশ করো। লেখাপড়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের নিয়ে কাজের ৪৩ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি– সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কখনো কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, শিশু চায় দৃষ্টান্ত। সে সরাসরি কিছু শেখে না। সবকিছু দেখে দেখে শেখে। সে খুব ভালো অনুকরণ করতে পারে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করে।

চারপাশে সবাই যখন মিথ্যা বলছে তখন শিশু কীভাবে সত্য বলতে শিখবে? মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, খুব যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। এমন দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য।

আমাদের সমাজে সাধারণত শিশুদের নিয়ে ভাবা হয়–'ও কী মতামত দেবে? ও আর কতটুকু বোঝে?' শিশুও দেখে–সব সিদ্ধান্ত ওর ওপরে চাপানো হচ্ছে। পরিবারের সবাই মিলে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছে না বা সিদ্ধান্ত শেয়ার করছে না। ফলে সে-ও ভেতরে ভেতরে কর্তৃত্বপরায়ণ একজন মানুষ হিসেবে বড় হতে থাকে। আবার শিশু যদি দেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হচ্ছে, তাহলে সে বেড়ে উঠবে আরো মানবিক হয়ে।

যেমন, আপনি ঠিক করলেন সন্তানকে অঙ্কে একটু ভালো করাবেন। তাহলে তার সাথে যে কথোপকথন করবেন, সেটা নিয়ে আপনাকে আগে একটু ভাবতে হবে। সে কোনো ভুল করলে আপনি আলোচনা করবেন যে, শীতের দিনে গরম জামা না পরে বেরিয়ে গেলে সর্দি হয়ে যাবে। আর অসুস্থ হলে বন্ধুদের সাথে খেলতেও পারবে না। আপনি যখন সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজেও গরম জামা পরবেন, তখন সে বুঝবে। নয়তো সে জেদ করবে অথবা ভাববে যে, চাপিয়ে দিল।

মা-বাবা যদি মনে করেন যে, আমার সন্তান ভুল করতে পারবে না, তাহলে সে কখনো সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না। যে সবসময়

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

হুকুম তামিল করছে, সে কোনোদিন স্বকীয় মানুষ হবে না। সে নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

পরিবারগুলোতে এরকম প্রায়ই হয়–সন্তান ক্রিকেট খেলতে চাচ্ছে আর অভিভাবক বলছেন, না, পড়তে বসো। এই ক্ল্যাশ অব ইন্টারেস্ট থেকেই শিশুর অন্তরে অনেক রকম ক্ষতিকর চিন্তা আর ক্ষোভ দানা বাঁধে। এগুলো দূর করতে হলে আপনাকে একটা আলোচনায় আসতে হবে।

এখন মুশকিল হয়েছে, সন্তানদের দেয়ার মতো সময় আমাদের নেই। ইংরেজিতে আমরা বলি 'কোয়ালিটি টাইম'। আপনি যখন ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরছেন, তখন সে কিছু একটা বললে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, চুপ করো। সন্তান কাছে এলেই তাকে থামিয়ে দিচ্ছেন, তার সাথে বসাটা মুলতবি করছেন। আমি শুধু অভিভাবকদের বলব–শিশুর জন্যে আপনার সময়টা বাড়ান। ওদের সূর্যাস্ত দেখান, পাঁচ রকম পাখি দেখান, পাঁচ রকমের গাছ দেখান, ফুল চিনতে শেখান। এটাই শিক্ষা।

একবার পড়ালেখা শিখলে বই সে একাই পড়তে পারবে। ক্লাসে যে বইটা একবছর ধরে পড়ানো হয়, সেই বইটা তো শিশু তিন দিনে শেষ করতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বয়স-উপযোগী অন্যান্য শিক্ষাটা ওর হচ্ছে কিনা। এমন উদাহরণও আছে–এসএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেছে কিন্তু ট্রেনের বগি আর কম্পার্টমেন্টের পার্থক্য সে বোঝে না। কারণ কোনোদিন সে ট্রেনে চড়ে নি, রেললাইন দেখে নি। অর্থাৎ শিশুকে লার্নিং অব লাইফ দিতে হবে। এ শিক্ষা আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ দেয় না, তাই এ-কাজ করতে হবে বাবা-মা-অভিভাবকদের।

আপনিও যদি জিপিএ ফাইভের ফাঁদে পড়ে যান, তাহলে আপনার সন্তান সামগ্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হবে। তার হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ হলো, অঙ্কে-ইংরেজিতে সে দুর্দান্ত নম্বর পেল কিন্তু তার মানবিক বোধগুলো বিকশিত হবে না। তখনই দেখা যায়, সে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে। কারণ তার মূল্যবোধের জায়গাটা তো ফাঁকা!

আমি অনেকদিন থেকে এ কথাটাই বলছি–একটা প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না। সত্য যদি ১০০ হয়, মিথ্যা তো শূন্য। অথচ সে ভাবে, মিথ্যা ৮০। মিথ্যা দিয়েও সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। এ বিষয়টাই সবচেয়ে ভয়ংকর। এভাবে সমাজ বেশি দূর যেতে পারবে না।

event.quantummethod.org.bd

সমাজের এই যে সংকট, এটা কিন্তু ছোট ছোট জায়গা থেকেই মেরামত হতে হবে। অর্থাৎ আপনি আপনার পরিবারের মধ্যে যদি সত্য আর মূল্যবোধের চর্চাটা শুরু করেন, তাহলে সেটা ক্রমান্বয়ে একসময় চারপাশকে প্রভাবিত করবে।

আমি হতাশ হই না। কারণ সততা, কল্যাণ বা যা-কিছু ভালো, সেটার জোর এত বেশি যে, কোনো ব্যাধি বা অকল্যাণ এর সামনে কখনোই টিকতে পারবে না।

তবে এর জন্যে ভালো বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চার মধ্যে আনতে হবে। একবার যদি এটা চর্চার আওতায় আনা যায় যে, বাড়িতে আমরা কিছুতেই কপটতা করব না, তাহলে শিশু সেভাবেই বেড়ে উঠবে। চারপাশে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল আমাদের নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হবে। সবাইকে সত্যের ওপর দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে হবে ইতিহাসের সঠিক রাস্তায়। আর এভাবেই শিশুর সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে একটা স্পষ্ট, সৎ ও অকপট সম্পর্ক।

শিশু সাদাকায়ন, চট্টগ্রাম
১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব
ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান।
বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

event.quantummethod.org.bd

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সমৃদ্ধ জাতি

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

গ্রামের দরিদ্র কৃষক রহিম মিয়া। সেই গ্রামেরই দুই ধনী ব্যক্তি চৌধুরী সাহেব ও মৃধা সাহেব। তাদের মধ্যে কিছুটা রেষারেষি আছে। গ্রামে প্রভাব ধরে রাখার জন্যে দু-পক্ষেরই লোক দরকার। তাই তারা দুজনেই চেষ্টা করে রহিমকে হাতে রাখার। ফলে রহিম প্রয়োজনের সময় দুজনের কাছ থেকেই টাকাপয়সা পায়। এবং এটা শোধও করতে হয় না।

হঠাৎ মৃধা সাহেব মারা গেলেন। এর কিছুদিন পর রহিম গেল চৌধুরী সাহেবের কাছে। একজোড়া গরু কেনার জন্যে টাকা ধার চাইতে। চৌধুরী সাহেব ভেবে দেখলেন, যেহেতু মৃধা সাহেব এখন নেই, রহিমকে হাতে রাখার আর প্রয়োজন কী! চৌধুরী সাহেব বললেন, রহিম, তোকে ধার তো দিতে পারছি না। তবে আমার মেয়েজামাই যে ব্যাংকে চাকরি করে, সেখান থেকে তুই ঋণ নিতে পারবি।

রহিম ব্যাংকে গেল ঋণ নিতে। মেয়েজামাই বলল, জমির দলিল বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে যান। পাঁচ বছরের মধ্যে শোধ করলেই হবে। অগত্যা রহিম তার পাঁচ কাঠা জমি বন্ধক রেখে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিল। ঋণ নিয়ে বাড়ি ফিরছে। মাঝপথে রহিমের নেশাখোর ছেলে জোর করে বাবার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ছিনিয়ে নিল। একটু পর পাওনাদারের সাথে দেখা। 'রহিম, তুই নাকি টাকা পেয়েছিস। আমার মেয়ের বিয়ে, কিছু অন্তত ফেরত দে।' রহিম পাঁচ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হলো। ১৪ হাজার টাকা নিয়ে রহিম কোনোরকমে বাড়ি ফিরল। তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলল, ছয়

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মাস আগে মেয়ের বিয়ে দিলাম। জামাইটাকে দাওয়াত দিতে পারি নি। তুমি তো ব্যাংক থেকে টাকা পেয়েছ। যাও, বাজার করে আনো। রহিমের আরো দুই হাজার টাকা খরচ হলো। থাকল বাকি ১২ হাজার টাকা।

পরদিন সে দুটো গরু কিনতে পারল না। কিনল একটা। চাষের সময় সেটাকেই জোয়ালের একপাশে দেয়, আরেক পাশটা নেয় নিজের কাঁধে। ফলে ভালোমতো চাষও করতে পারল না। ওদিকে পাঁচ বছর পর ব্যাংকে ২০ হাজার টাকার ঋণ সুদে-আসলে দাঁড়াল ৬০ হাজার টাকা।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর ৪৪টা দরিদ্র দেশের অবস্থাও রহিম মিয়ার মতো। আশির দশকে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পরস্পরের শত্রু। তাদের মধ্যে এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। তখন সাহায্যগ্রহীতা দরিদ্র দেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭। এদেরকে হাতে রাখার জন্যে দুই দেশই খুব সহজ শর্তে ঋণ দিত; কিন্তু নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে খান খান। আমেরিকা হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। বস্তুত তখন থেকেই বিদেশি সাহায্যের ব্যাপারে সুর পাল্টে গেল আমেরিকার।

চৌধুরী সাহেব যেমন রহিম মিয়াকে তার জামাইয়ের ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বলেছিল, আমেরিকাও তেমনি সাহায্যপ্রত্যাশী দেশগুলোকে বলল বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে। দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য না দিয়ে আমেরিকা সেই টাকা দিয়ে বিশ্বব্যাংকের শেয়ার কিনে রাখল। বিশ্বব্যাংকে যে দেশের শেয়ার যত বেশি, সে-দেশ থেকে কর্মচারীও তত বেশি। সুতরাং বিশ্বব্যাংক যে ঋণ দেয় তা মূলত আমেরিকার পরামর্শেই দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, বিদেশিরা সাহায্য দেয় কেন? এক সমীক্ষায় দেখেছি, বিদেশিরা যদি ১০০ ডলার দেয়, তার মধ্যে আমার দেশের অর্থনীতি পায় মাত্র ২০ ডলার। বাকি ৮০ ডলারের মধ্যে ৩৫ ডলার নিয়ে যায় বিদেশি কনসালটেন্ট, যারা ঋণদানকারী দেশেরই অবসরপ্রাপ্ত লোক। ১৫ ডলার যায় 'প্রকল্প-পরিচালক' নামে যে কর্মকর্তা-শ্রেণি তৈরি করা হয়, তাদের এসি রুম, গাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যয় মেটাতে। এ-ছাড়াও আরো ১৫ ডলার যায় টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হারের তারতম্য হওয়ায়। বাকি ১৫ ডলার যায় ঋণদানকারী দেশের কাছ থেকে চড়াদামে কাঁচামাল কেনার পেছনে। দরাদরি বা অন্য দেশ থেকে কেনার কোনো সুযোগ এখানে থাকে না। কারণ চুক্তির শর্ত অনুসারে তার কাছ থেকেই আমাকে কিনতে হবে। আসলে ঋণগ্রস্তের কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

event.quantummethod.org.bd

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জন্ম। যুগে যুগে মোগল-ইংরেজ সবাই এখানে এসেছে, কারণ ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দুটো অঞ্চলের একটি হলো বাংলা। যখনই নিজের উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও অধিকারের প্রতি এদেশের মানুষ অসচেতন হয়েছে তখনই অন্যেরা ঢুকে পড়েছে। হাজার বছর পরাধীন থাকার পর ১৯৭১ সালে বহু মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি স্বাধীনভাবে পথচলার অধিকার, রাষ্ট্রীয় সীমানা ও সার্বভৌমত্ব।

দেশ পুনর্গঠনের জন্যে একসময় বিদেশি সাহায্য নিতে হয়েছে। এখন তো ঋণশোধ করার পালা। কিন্তু আমাদের বার্ষিক বাজেটের ১৬% যায় বৈদেশিক ঋণের সুদ শোধ করতে। কোনো দেশের বার্ষিক সুদের পরিমাণ যদি ৪৮ হাজার কোটি টাকা হয়, তাহলে সেই দেশের মোট ঋণের পরিমাণ কত! একটি হিসাব মতে, আমাদের ১৬ কোটি মানুষের প্রত্যেকের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২৮ হাজার টাকা। আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জে যে ছোট্ট শিশুটি জন্মেছে কিংবা নীলফামারীর ৮০ বছরের যে বৃদ্ধ রমিজুদ্দিন মারা গেছে, দুজনেই ২৮ হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত। বৈদেশিক সাহায্য এভাবেই গোটা জাতিকে ঋণগ্রস্ত ও পরনির্ভর করে তুলেছে।

ছোটবেলায় দেখেছি নদীতে হঠাৎ আসা জোয়ারে বাঁধ ভেঙে গেছে, গ্রামের মোড়লের ডাকে সবাই কোদাল নিয়ে নেমে পড়েছে ঠিক করতে। রাস্তায় গর্ত হলে এলাকাবাসী নিজেরাই ঠিক করে ফেলত। আশির দশকে এসে দেখা গেল, বাড়ির সামনে গর্ত হলেও কেউ কিছু করছে না। সবাই আশায় আছে—কখন এলজিইডি এসে ওটা ঠিক করে দেবে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে একটা উদ্যম ছিল, বিদেশি সাহায্য তা নষ্ট করে দিল।

ঋণ আজ নানাভাবে আমাদের আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি ও স্ব-উদ্যোগের ক্ষতি করছে। সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেছে। অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের প্রভাবে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। অর্থনীতিতে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, স্বনির্ভরভাবে তা আমাদের সমাধান করতে হবে। কিন্তু নিজের উদ্যোগ না থাকলে আমরা অন্যের দ্বারস্থ হয়ে পড়ব। সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে চাইলে স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়ন এজন্যেই এত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্ত আলোচনা, ৩ নভেম্বর ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

নুরুল আলম।
১৯৮৫ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত হন। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। ১৯৮৪ সালে যোগ দেয়ার পর থেকেই তিনি শুরু করেন স্কুলটিকে পাল্টে দেয়ার কর্মযজ্ঞ। অজপাড়াগাঁয়ের এ স্কুলটি আজ সুপরিচিত। এখানে হাসি, আনন্দ আর খেলাচ্ছলে পড়াশোনা করে ছাত্ররা। শ্রেণীকক্ষে গান, কবিতা আর সুরের এক মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে তিনি ছাত্রদের পড়ান। তার এ দুর্লভ পাঠদান-পদ্ধতি তাকে করে তুলেছে অনন্য।

event.quantummethod.org.bd

শিক্ষককে হতে হবে শিক্ষার্থীর মনমাঝি

নু রু ল আ ল ম

কবি গোলাম মোস্তফার একটি কবিতা আছে–*শিক্ষক মোরা শিক্ষক/ মানুষের মোরা পরমাত্মীয়,/ ধরণীর মোরা দীক্ষক।* কবিতার এ চরণগুলোকে নিজের আত্মার সাথে মিলিয়ে নিলেই শিক্ষকরা পারেন ছাত্রদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমাদের শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী ও সম্ভাবনাময়। তাদেরকে জাগানোর ও এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের শিক্ষকদের। তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রচলিত পোষ মানানো শিক্ষার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিকামী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গতানুগতিক ও একঘেয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ এবং মননশীলতার উন্মেষ ঘটানো। এজন্যে শিক্ষককে হতে হবে শিক্ষার্থীর মনমাঝি। শিক্ষককে জানতে হবে ছাত্রের মন জয় করার উপায়। এটি করতে পারলেই সব ভয়-ভীতি ও সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সে শিখতে পারবে স্বাধীনভাবে। বস্তুত তিনিই একজন সার্থক শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার সময় যাকে ছাত্ররা বলে–আরো কিছু সময় থাকতে হবে।

আমার শিক্ষকতা জীবনে আমি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি আনন্দময় শিক্ষার মাধ্যমে। চেয়েছি আমার ছাত্ররা সবাই হবে একেকজন দৃষ্টিনন্দন মানুষ। শুধু খেলাধুলাই নয়, আমার স্কুলের

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সব ছাত্রই গান গাইতে পারে, জানে কবিতা আবৃত্তি করতে। আসলে 'পড়া শেখা হয়েছে কিনা' প্রতিদিন কঠোর ভাষায় এই একই প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মেধাকে নষ্ট করে দেয়। প্রচলিত পড়ালেখার ধারণা থেকে আমি আমার ছাত্রদের বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। তাই স্কুল ছুটির পরও তারা বাড়ি যেতে চায় না, আরো থাকতে চায়।

আমাদের স্কুলে পাঠদানের মাঝে মাঝে ছাত্রদের বোঝার সুবিধার্থে উপস্থাপন করা হয় বিষয়ভিত্তিক উপকরণ। এর মাঝে রয়েছে—শহর, নগর, গ্রাম, নদ-নদী, জলপ্রপাত, আগ্নেয়গিরি, বন ও মরুভূমির মডেল, ৩০টির বেশি মানচিত্র, বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক রাষ্ট্রনায়ক ও বিজ্ঞানীদের ছবি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ব্যাপক। বিশুদ্ধ পানি, খাবার স্যালাইন তৈরি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, টিকাদান বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে মাসে একবার বাড়ি বাড়ি যায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কখনো মানুষকে সচেতন করে তুলতে নাটিকা পরিবেশন করে।

আমাদের এলাকায় একবার ইঁদুরের উৎপাত খুব বেড়ে গেল। কৃষি বিভাগ ঘোষণা করল—যে যত ইঁদুরের লেজ জমা দিতে পারবে, তাকে তত পুরস্কার দেয়া হবে। ব্যস, একদিনেই বাড়ি, বাঁধ, জমি ঘুরে ইঁদুর নিধন করে রেকর্ড সংখ্যক পুরস্কার জিতে নিল ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠা সমিতির মাধ্যমে মাছ চাষ, সেলাই প্রশিক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, মুরগি ও গরু পালনের মতো কাজগুলো করা হয়।

আমি বিশ্বাস করি, স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে মানুষের মিলনকেন্দ্র। যেমন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিণত হয়েছে মানুষের মিলনকেন্দ্রে। মানুষ এখানে ভালবেসে আসছে। জীবনকে সুন্দর করার জন্যে আসছে। বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কোনোকিছু চাপিয়ে দিতে চাইলে এই ভালবাসা ও আগ্রহটা মানুষ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও তা-ই।

আমাদের স্কুলটি আজকের পর্যায়ে এসেছে কারো অর্থ বা কারো সাহায্যে নয়। আমাদের উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। শুরুটা নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল, কিন্তু আমি শুরু করেছিলাম। শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কখনো কেউ বৃত্তি পায় নি। এ স্কুলে যোগদান করার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে আমি রাত-দিন পরিশ্রম করেছি আমার ছাত্রদের জন্যে। ফলে সে-বছর চার জন ট্যালেন্টপুলসহ মোট ছয় জন ছাত্র বৃত্তি লাভ করে। ১৯৯১ সালে

event.quantummethod.org.bd

বিদ্যালয়টিকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেয় ইউনিসেফ। ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ২০০০ সালে জাতীয় পদক লাভ করে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি।

আমার কোমলমতি ছাত্রদের অন্তরের ডাক আমি অনুভব করি। ওদের ভেতরে যে আকুতি, তার মর্মকথা একটাই–You help me to grow today, I will help the nation tomorrow. আর কোনো মানুষ যখন ভালো কাজের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে সে হয়ে ওঠে অত্যন্ত পছন্দনীয়। আসলে কর্মই ধর্ম, কর্মই জীবন, কর্মই ইবাদত। তাই যে মানুষ কর্মবীর হয়, রোগ তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারে না।

আঘাত আছে জানি/ জানি ব্যথা আছে,/ তাই বলে তো বক্ষে পরাণ নাচে। তাই যত বাধা আর প্রতিকূলতাই আসুক, আমার ছাত্রদের শিক্ষার মান ত্বরান্বিত করতে আমি সময় ও শ্রম দিয়েছি আনন্দিতচিত্তে। আজও প্রতিদিন আমি সবার আগে স্কুলে যাই, সবার পরে আসি। সহকর্মী অন্যান্য শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্ররাও আমার বন্ধু।

আমি বিশ্বাস করি, একজন মানুষ যদি কাজ শুরু করে, নেতৃত্ব দিতে পারে, তাহলে সে-কাজটি সফলতার মুখ দেখবেই। আর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হলো ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসা। জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার যখন আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে–আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না।

আমার সমগ্র চেতনা ও ভাবনা জুড়ে সবসময় থাকে আমার ছাত্ররা। কারণ ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। ওদেরকে সবসময় ওদের মতো করে বলতে দিতে হবে। ভাবতে দিতে হবে ওদের মতো করেই। শিক্ষকরা সমাজের মানুষকে পথ দেখান, উজ্জীবিত করেন, কাজের অনুপ্রেরণা দেন। কিন্তু শিক্ষকরাই যদি সেই কথাকে বিশ্বাস না করেন, সেই চেতনাকে লালন করতে ব্যর্থ হন তাহলে সমাজ দিকভ্রান্ত হয়। এসব সীমাবদ্ধতাই আমাদের আজও এত পিছিয়ে রেখেছে।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হয়েছে আমাদের দেশ। সেদিন আমরা সবাই জেগে উঠেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি, এক হাত নেই এমন একজন মানুষ ঢাকার রাস্তায় 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছে। সেদিন বুঝেছিলাম, একজন পঙ্গু মানুষও জেগেছে, এ দেশ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমি মনে করি, শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে সেই প্রবল বিশ্বাসে জেগে উঠতে হবে। সেজন্যে চাই যোগ্য নেতৃত্ব। আর প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মানুবর্তিতা। তাহলেই আমরা পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে পারব। এজন্যে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা টিমওয়ার্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের দেশে কোনো কাজ হয় না 'আমিত্ব' ভাবের কারণে। তাই নিজেকে বিবেচনা করতে হবে–আমি সবার জন্যে।

কবির ভাষায়–*'যত বর্ষ বেঁচে আছি/ তত বর্ষ মরে গেছি,/ মরিতেছি প্রতি পলে পলে/ জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি/ জানি না মরণ কারে বলে'*। আমাদের সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। মরতে যখন হবেই তখন অমরত্বের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্যে চলুন সবাই মিলে দেশের সেবা করি, দেশকে ভালবাসি। আজকের শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি।

মুক্ত আলোচনা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সংস্কৃতি

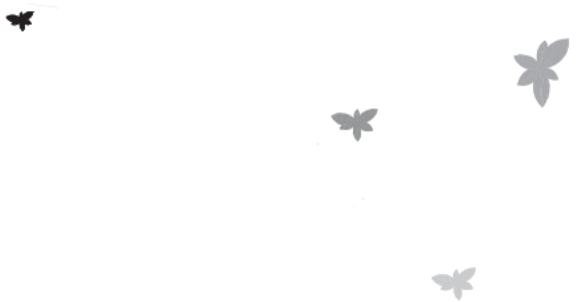

speech.quantummethod.org.bd

আহমদ রফিক।
মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।
প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক ও সাহিত্যিক।
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা, গবেষণা,
সংরক্ষণ ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে
সচেতনতা সৃষ্টিতে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

event.quantummethod.org.bd

বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়াতে পারবে তরুণরাই

আ হ ম দ র ফি ক

অভিভাবকদের প্রায়ই প্রশ্ন করি, সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছেন কেন? উত্তর একটাই–আমরা কি সন্তানের ক্যারিয়ারের কথা ভাবব না? যুক্তিসঙ্গত কথা, এতে আমি অন্যায়ের কিছু দেখিও না। শিক্ষা ও জীবিকার সঙ্গে যে ভাষা যুক্ত–সে ভাষাকেই মানুষ গ্রহণ করবে, এটাই স্বভাবিক।

কিন্তু এতে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। বিভাজন সবসময়ই খারাপ। প্রথমত, লেখাপড়ার শুরুতেই কিছু শিক্ষার্থী বাংলা মাধ্যমে, কিছু ইংরেজি মাধ্যমে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বাংলায় যারা পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তারা একটা হোঁচট খায়। কারণ এদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমটা হলো ইংরেজি। ফলে সে ইংরেজি মাধ্যমের সহপাঠীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তাই ভাষাকে সার্বজনীন না করা, ভাষাকে জীবিকা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না করার পরিণামে সমাজের বৃহত্তর একটি শ্রেণি শিকার হচ্ছে বৈষম্যের। বিশেষত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা। এটা অন্যায়ও বটে।

এই বৈষম্য-মুক্তির উপায় কী? উপায় আমাদের তরুণ প্রজন্মের হাতে। তরুণরাই পারে মহান ভাষা আন্দোলনের সেই স্লোগানটি বাস্তবায়ন করতে–'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো'। আজকের তরুণদের বলতে চাই–তোমরা যদি উঠে দাঁড়াও অর্থাৎ মাতৃভাষার সঠিক চর্চা করো এবং সবার মাঝে আশাবাদের সঞ্চার করতে পারো, তাহলে সমাজের সবাই সচেতন হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমরা আমাদের ভাষাকে নিয়ে যেতে পারব। বিন্দু থেকে সিন্ধুর জন্ম হয় এভাবেই।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

উদাহরণ দেই। ইউরোপে মধ্যযুগ ছিল ল্যাটিন ভাষার স্বর্ণযুগ। বিভিন্ন জাতি সে-সময় নিজেদের মাতৃভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। মাতৃভাষা চর্চার পথ ধরে ইউরোপে উদ্ভব ঘটে জাতিরাষ্ট্রের। সূচিত হয় রেনেসাঁ, জ্ঞানচর্চা ও শিল্পবিপ্লব। আবার চীনা ও জাপানি ভাষার বর্ণলিপি হলো প্রাগৈতিহাসিক লিপি, খুবই জটিল। সেই ভাষায় যদি ব্যবসা-বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চলতে পারে তাহলে বাংলার মতো উন্নত ভাষাতেও তা অবশ্যই করা যাবে।

ইদানীং অধিকাংশ তরুণকে দেখি, শুধু নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত– বিদেশি ভাষা শিখবে, বিদেশে যাবে। কিন্তু ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি প্রত্যেকের রয়েছে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা। একজন কবি শুধু বিনোদনের জন্যে কবিতা লিখতে পারেন না, সমাজের বিকাশেও তার কিছু করণীয় আছে। ভাষার ক্ষেত্রেও তরুণদের এজন্যেই এগিয়ে আসতে হবে। ভাষা আন্দোলনে তা-ই হয়েছে। তরুণদের অন্তরে থাকে সমাজ বদলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যা তাদের সবকিছু বিসর্জন দিতে সাহস জোগায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা। আমি নিজেও ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি ২৩ বছর বয়সে। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র।

৪০-এর দশকের শেষ দিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন থেকেই মুসলিম লীগের নেতাদের অনেকে বলতে থাকেন– উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার হন, যা ধীরে ধীরে একটি গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু', তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদের দাবানল। জানা গেল, ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। ছাত্র-জনতা সিদ্ধান্ত নিল, সেদিনই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারাদেশে হরতাল, সমাবেশ ও মিছিল করবে।

পাকিস্তানি সরকার ভয় পেয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দিল–২১ ফেব্রুয়ারি থেকে একমাস পর্যন্ত ঢাকায় সভা-সমাবেশ-মিছিল সবকিছু নিষিদ্ধ। ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। ঘোষণা শুনেই বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদুল্লাহ হলে। গিয়ে দেখি সবাই

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বলছে, আমরা যে-কোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙব। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও চিৎকার করে উঠল—১৪৪ ধারা মানি না।

সে-বছর বেশ শীত ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আনাগোনায় সরব হয়ে উঠল ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। তখনকার আর্টস বিল্ডিং, এখন যেটা ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সি, ওখানকার আমতলায় সভা হলো। ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন বক্তব্য রাখলেন। ১০ জন করে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। বিরামহীন স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। মিছিল গেট পর্যন্ত যেতেই পুলিশি আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হলো, বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হলো। নিরস্ত্র ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সাথে চলতে থাকল সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ।

আমার চোখে দেখা—মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকের মাথায় গুলি লেগে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকতের উরুতে গুলি লাগে, অস্ত্রোপচার করেও বাঁচানো গেল না। আবদুল জব্বারের গুলি লাগল তলপেটে, তিনিও শহিদ হলেন।

ছাত্র নিহত হয়েছে, এই খবর পেয়ে সাধারণ মানুষ একে রূপ দিল গণ-আন্দোলনে। নিহতদের স্মরণে সবাই গর্জে উঠলেন নতুন স্লোগানে—'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'। দেশের সমস্ত জেলা, এমনকি গ্রামগুলোতেও শুরু হলো মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি। পরের বছর থেকে শুরু হলো একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' পালন, যা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বড় প্রেরণা জুগিয়েছে। এর পথ ধরেই রচিত হয়েছে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে জন্ম নিল স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালে বাংলা ভাষা পেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি।

আজকের তরুণদের বলব, মাতৃভাষা বিকাশের এই মন্ত্রটা তোমরা গ্রহণ করো। যা এখনো সম্ভব হয় নি, তোমরা তা সম্ভব করো। আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করো যাতে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, উচ্চ আদালত এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা চালু হয়।

মুক্ত আলোচনা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

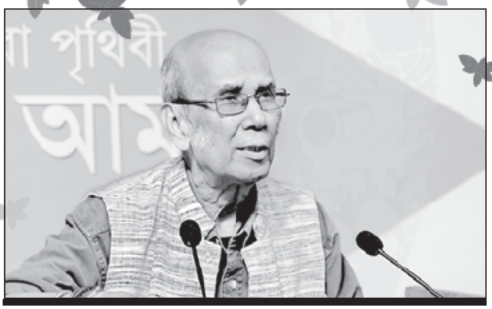

সৈয়দ শামসুল হক।
বাংলা ভাষার বরেণ্য কবি
ও সব্যসাচী লেখক।

event.quantummethod.org.bd

স্বপ্নে কর্মে উদ্যমে কোয়ান্টামম আরো বিকশিত হোক

সৈয়দ শামসুল হক

আমি লেখক হতে চেয়েছিলাম। বাবা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। কারণ তখনকার দিনে মনে করা হতো–লেখক হলে লোকটা উদ্‌ভ্রান্ত হবে, দরিদ্র থাকবে, কোনো উপার্জন থাকবে না, সে যক্ষ্মায় ভুগে মারা যাবে ইত্যাদি। এটা হচ্ছে আসলে একটা সামাজিক কল্পনা। সামাজিক কল্পনা সব মানুষকে চিরুনির দাঁতের মতো সমান দেখতে চায়। কেউ একটু বেড়ে গেলেই ছেঁটে দিতে চায়। এখানেই আসে নিজের জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্ন। আসে ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্ন।

ঝুঁকি নিতে হয়। আমি দেখেছি যারা কোনো বড় কাজ করেছেন, সবাই কোনো না কোনো ঝুঁকি নিয়েছেন। সবকিছু নিরাপদ নির্বিঘ্ন থাকবে, তারপর আমি একটা মহৎ কাজ করব, এটা হয় না। কোয়ান্টামমে এসে মনে হচ্ছে আমার বন্ধু শহীদ আল বোখারী মহাজাতকও এখানে এত কাজের সূচনা করেছেন, তিনিও ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাই তিনি পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, শিক্ষা চার দেয়ালের মধ্যে নীরস কাঠের বেঞ্চিতে বসে নয়, প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমার খুব ভালো লাগছে যে, এখানে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে প্রকৃতির কোলে বড় হচ্ছে। মানুষ তো স্বর্গ কল্পনা করে, আবার স্বর্গ সৃষ্টিও করে। এটা যেন পৃথিবীর বুকে সেই একখণ্ড স্বর্গ।

কোয়ান্টামমের প্রকৃতিতে এত রঙের বৈচিত্র্য, এত মানুষের বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য–এটা এককথায় অনন্য। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই তো

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সত্যের সন্ধান করতে হয়। সত্যকে খুঁজে পেতে হয়। সেজন্যে চাই দেখার চোখ। সেই চোখটা থাকলে, অন্তত আর কিছু না হোক, জীবনটা সহজে বহনযোগ্য মনে হয়। অনেকে যেমন বলেন, জীবনটা খুব ভার হয়ে গেল, আর পারি না–সেটা হয় না।

যেমন, এই যে কোয়ান্টামমে এসেছি, এখানকার প্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি কদিন ধরে, এতে নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। তেমনি পারিপার্শ্বিক নানা বৈচিত্র্যগুলোকে যখন ধারণ করা যায়, জীবনও উপভোগ্য হয়ে ওঠে খুব। তা না হলে জীবন একটা বোঝা ছাড়া কিছু নয়।

আমি একটা ছড়াতে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম, যার সারমর্ম হলো, গর্দভ সারাজীবন চিনির বোঝা টেনে যায়; কিন্তু একবার তা চেখে দেখার জন্যেও ঘাড়টা ঘোরায় না–দেখি তো একটু, কী বইছি! এই হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ। কেবল বোঝা টেনেই যাচ্ছে। অথচ চারপাশের প্রকৃতি, মানুষ আর জীবনের বৈচিত্র্যকে বুঝতে পারলে জীবন কত আনন্দময়! আজ সকালেই, ঘুম ভেঙে যখন রাহমাতানের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, খুব ভালো লাগল। হঠাৎ মনে হলো, কোরআনে আল্লাহ ভোরের শপথ করেছেন। অর্থাৎ নিজের সৃষ্টিতে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন–ভেবেছেন এর নামেও শপথ করা যায়, তাহলে সত্যটা বোঝানো যাবে।

তবে মানুষের জন্যে মুগ্ধতা খুব ভালো কিছু নয়। মুগ্ধ হলেই প্রশ্ন থেমে যায়। মানুষ বিবশ হয়ে যায়। প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিই তার আর হয় না। কিন্তু প্রশ্নই তো সত্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্রধান উপায়। ধর্মপ্রচারকেরা প্রশ্ন করেছেন। সাহিত্যিকরা জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। সক্রেটিস বলতেন, প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার উত্তর পাবে। উত্তর তোমার ভেতরেই আছে। মহাজাতকের কথা এবং তার লেখায় আমি এই দর্শনগুলো দেখতে পাই–মানুষের ভেতরেই রয়েছে এক অসীম শক্তির আধার, একে জাগ্রত করলেই আমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাব।

কোয়ান্টামের প্রাণপুরুষ মহাজাতক, যাকে সবাই গুরুজী নামে চেনেন, তার সাথে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। আমি তখন লন্ডনে থাকি। সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে দেশে এসেছি। সে-সময় *বিচিত্রা* অফিসে একদিন তার সাথে আমার দেখা এবং পরিচয়। তার পরনে কালো ফতুয়া, কালো পাজামা। স্মিত চেহারা ও মিষ্টি হাসিতে স্নিগ্ধদর্শন একজন মিতভাষী মানুষ। সেই দিনটি থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

১৯৭৬ সালে আবার দেশে এলাম। *বিচিত্রা*-য় আমাদের দেখা হতো। নানা বিষয়ে গল্প হতো, যদিও তিনি বরাবরই ক্ষীণভাষী। সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা তখন খুব ভালো নয়, মানুষের মন ভারাক্রান্ত। অনেকেই নানা কারণে হতাশ। এর মধ্যেও দেখতাম, মহাজাতক প্রায়ই বলতেন– একটা পরিবর্তন আসবে। সময় বদলাবে। এভাবে চলতে পারে না।

তার কথাগুলো আমার ভালো লাগত। তার দিকে আমি একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। তিনিও আমাকে পছন্দ করতেন। এরপর মাঝখানে বহুদিন আর নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তিনি তার কাজ করছেন, আমি আমার কাজে ব্যস্ত। মাঝেমধ্যে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়। এভাবেই চলছিল।

কয়েক বছর আগে কোয়ান্টামের একটি রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমি তার আমন্ত্রণ পাই। দীর্ঘদিন পর আমাদের সাক্ষাৎ হলো। মহাজাতক আমাকে কোয়ান্টাম ল্যাব ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি বিস্মিত হলাম। এত মানুষ এখানে রক্ত দিচ্ছে, অন্যের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে! মনে হলো, তিনি এখন সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় কাজ করছেন। দিনে দিনে তার কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হচ্ছে।

কোয়ান্টামের বইপত্র পড়ে দেখলাম–সেই প্রথম জীবনে যে সত্য আর আশাবাদের কথা তিনি বলতেন, এতে তারই প্রতিফলন। কোয়ান্টামমে এসে তার বাস্তব রূপ দেখতে পেলাম। বিচিত্র ধর্মবর্ণের এত বিদ্যার্থী এখানে পড়াশোনা করছে, ওদের সাথে কথা বলে মনটা ভরে গেল।

আমাদের চারপাশে অনেক হিসেবি স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, যারা এ জাতীয় কাজগুলো করেন ঢাকার আশেপাশে। যাতে বিদেশিরা আসতে পারে, সেইসাথে কিছু সাহায্যও উড়ে আসে। সাংবাদিকরা যাতে নিয়মিত আসতে পারেন, তাতে প্রচার পেতেও কিছু সুবিধা হয়। এমন উদ্দেশ্য এখানে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমার খুব ভালো লাগছে।

উদ্দেশ্যটা নেই বলেই কোয়ান্টাম এটা করেছে ঢাকা থেকে এত দূরে, পার্বত্য এলাকায়। এমনিতেও আমাদের সমতলের বিশাল বাংলার তুলনায় এই পার্বত্য এলাকা কিছুটা অবহেলিত। সবমিলিয়ে বলতে পারি, একটি অসাধারণ কাজ এখানে হচ্ছে। স্বপ্নে, কর্মে, উদ্যমে কোয়ান্টামম ক্রমাগত আরো বিকশিত হোক, এটাই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : নভেম্বর ২০১৫

speech.quantummethod.org.bd

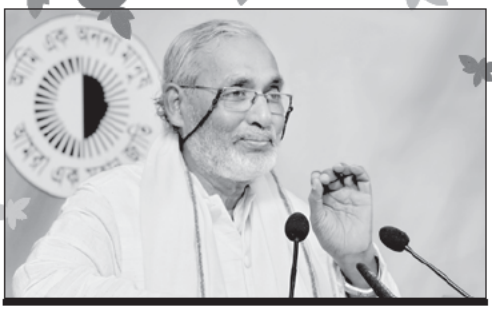

ড. এম শমশের আলী।
শিক্ষাবিদ পরমাণুবিজ্ঞানী লেখক গবেষক ও ধর্মতাত্ত্বিক। আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আন্তঃধর্মীয় ও সার্বজনীন সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাকে করে তুলেছে বিশিষ্ট ও অনন্য।

event.quantummethod.org.bd

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা, ধ্যান ও স্রষ্টাবন্দনা

এ ম শ ম শে র আ লী

আমি মূলত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু ঘটে, হোক বিজ্ঞানের জগতে বা সাহিত্যের জগতে, সেটা আমি বিজ্ঞানের আলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আমরা কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা যখন কোনো অনুষ্ঠান করি, তাতে তার গান, নাচ, আবৃত্তি এবং তার জীবন ও কর্ম নিয়ে নানামুখী আলোচনা থাকে। কবিগুরুর সাহিত্য-সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং যথার্থই বলা হয় যে, তিনি একজন গীতি কবি, মরমী কবি, প্রকৃতি প্রেমিক কবি, আধ্যাত্মিক কবি এবং সার্বজনীন কবি। কিন্তু অনুষ্ঠানে যা বলা হয় না, তা হলো তার বিজ্ঞান-মানসের কথা, তার বিশ্বচিন্তার কথা।

রবীন্দ্রনাথ তার জীবনব্যাপী নানা দেশ ঘুরেছেন। সে-সব দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও বহুমাত্রিক আয়োজন দেখেছেন। তাদের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, সেটা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এ-সম্পর্কে লিখেছেনও। বিজ্ঞানের শক্তি করায়ত্ত করতে পারলে চীন যে একদিন পৃথিবীর একটি বড় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে–এ ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করে গেছেন। ইতোমধ্যে তার একথা ফলেও গেছে।

জগৎ-পরিভ্রমণ করা এই মানুষটির যে একটি বিশ্বদর্শন ছিল, আমরা যাকে ইংরেজিতে বলি 'ওয়ার্ল্ড ভিউ', তা বলাই বাহুল্য। তার এ বিশ্বদর্শন

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বুঝতে হলে প্রকৃতই তার বিজ্ঞান-মানসকে আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু শুরুতেই বলেছি, আমরা সেটা বলি না বা বলতে চাই না। কেন? এর প্রধান কারণটি হলো, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে কাজ করেন, রবীন্দ্রনাথ চর্চা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে। আবার যারা বিজ্ঞান চর্চা করেন, তারা সাধারণত সাহিত্যের দিকে খুব একটা আগ্রহী হন না।

মজার কথা হলো, সাহিত্য যদি সত্যিই মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও পরিবেশের এক শৈল্পিক প্রতিচ্ছবি হয় এবং বিজ্ঞান যদি হয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে অবশ্যই একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। চিরন্তন এ কথাটাই আমরা অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ ও বিজ্ঞানীরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। বিপত্তিটা ঘটে সেখানেই।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক সূত্র ও তত্ত্ব। অথচ এ কথাগুলো যে বিজ্ঞানের, সেটা কোথাও 'নোটিশ জারি' করে বলা হয় নি কিংবা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি। আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-মানসের অভিনবত্ব এবং ওটাই তার সাহিত্যিক-মুনশিয়ানা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে প্রকৃতি ও পরিবেশ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র-তত্ত্ব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গায়ক-গায়িকারা এটা ভেতরে অনুধাবন করতে পারলে তাদের কণ্ঠে গানের আসল ভাবটা দারুণভাবে ফুটে উঠতে পারে। গীতের ভাব ছাড়া গীতের কথার কী মূল্য? রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের কিছু চরণ উদ্ধৃত করে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনারা সবাই জানেন *ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্* গানটার কথা। সে গানের এক জায়গায় বলা হচ্ছে–

মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥

মৌমাছি ও ফুল, এদের দুজনেরই দুজনকে দরকার। মৌমাছির দরকার ফুলকে, নইলে সে মধু সংগ্রহ করবে কী করে? ওদিকে ফুলের দরকার

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মৌমাছিকে। মৌমাছি ফুলের গায়ে এসে না বসলে তার পরাগায়ন হবে কী করে? কীভাবে হবে তার বংশবৃদ্ধি? কিন্তু মৌমাছি যদি ফুলকে গিয়ে শুধু একথা বলে যে, 'ফুল তুমি একটু উন্মোচিত হও, আমি তোমার কাছ থেকে মধু সংগ্রহ করব'—ফুল মৌমাছির এ আহ্বানে সাড়া না-ও দিতে পারে। তাই ফুলের চারপাশে উড়ে উড়ে সে মিনতি করতে থাকে এবং নিজের পাখার সাহায্যে বীণা বাজিয়ে চলে—এতে যদি ফুলের মন গলে!

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। মৌমাছির মধু ভিক্ষার এই শিল্পসৌকর্যময় কাতরতা দেখে সে মুগ্ধ হয়। নিজেকে মেলে ধরে মৌমাছির কাছে। এভাবে দুজনই দুজনের প্রয়োজন মেটায়। প্রকৃতিতে এই যে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক, এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয়ে থাকে সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ (Symbiotic Relationship)। প্রকৃতির এই খেলাটিকে রবীন্দ্রনাথ তার গানে কী অনুপম ভাষাতেই না ফুটিয়ে তুলেছেন! গায়ক-গায়িকারা এটি বুঝতে পারলে গানটি গাইতে গিয়ে তাদের ভালো লাগার পরিমাণ যে বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এভাবেই এক গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে গেয়েছেন অন্য গীত। যেমন, আলো আর উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা উল্লেখ করতে হয়—

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধ ভরে আত্মহারা ॥
আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা ॥
ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা—
আমার চলা যায় না বলা—আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা ॥

এ গানটি অনেকেই পরিবেশন করে থাকেন নদীর গান হিসেবে। এটা যতটা না নদীর গান, তার চাইতে বেশি চাঁপাতরুর গান। চাঁপাতরু নদীকে দেখে—সে পাগল-পারা গতিতে বয়ে চলেছে। এদিকে চাঁপাতরুর চলার কথা কেউ ভাবে না। তাকে দেখে অচল মনে হয় বটে কিন্তু তার সত্তার মধ্যেও একটা গতি আছে, যার ফলে তার অঙ্গে নবীন পাতা আসে, ফুল ফোটে। আর তরু নিজে তার এই চলার কথাটা গোপন রাখে।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

কিন্তু কী সেই গোপন কথা? সেটাই হচ্ছে আসলে বিজ্ঞানের কথা। ফটোসিনথেসিস বা সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কী ঘটে, তা বুঝলেই বিষয়টা খুব সহজ। মাটি থেকে পানি ও বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে এবং নিজের পাতার সবুজ অংশস্থিত ক্লোরোফিল ও সূর্যালোক ব্যবহার করে বৃক্ষ তার খাবার তৈরি করে–যার কিছুটা লাগে তার নিজের বৃদ্ধিতে আর বাকিটা লাগে অন্যের কাজে–ফুল ফল কাঠ ও তন্তু হিসেবে।

অর্থাৎ আদতে বৃক্ষ দেখতে অচল মনে হলেও তার ভেতরে রয়েছে একটি নীরব চলমান প্রক্রিয়া। সে নিয়ত কর্মপ্রাণ। তার এই পুরো প্রক্রিয়াটি আলোর ওপর নির্ভরশীল। তার যাত্রা আলোর দিকে। তাই তো চাঁপাতরু বলছে, *আমার চলা যায় না বলা–আলোর পানে প্রাণের চলা–*

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গান জোনাকি নিয়ে। দেখি সে গানে তিনি কী বলছেন :

ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি আঁধার-বাধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ ॥

রবীন্দ্রনাথ যে তীক্ষ্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে জোনাকিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার গানে এটি তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অভূতপূর্ব। জোনাকি যে প্রক্রিয়ায় নিজের দেহের রাসায়নিক শক্তিকে (chemical energy) তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় chemiluminescence। আলো একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। পুরো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের যে বর্ণালি (electromagnetic spectrum) তাতে বেতার তরঙ্গ (radio wave) থেকে শুরু করে গামা রে (gamma-radiation) পর্যন্ত সবই অন্তর্ভুক্ত। এই বর্ণালির একটি নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ (frequency) আমাদের চোখে দর্শনের অনুভূতি জাগায়। আর সে হিসেবে সূর্যের আলো, মোমবাতির আলো, হারিকেনের আলো, ইলেকট্রিক

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

টিউব বা ল্যাম্পের আলো এবং জোনাকির আলো সব একই ধরনের। কারণ সূত্রের দিক থেকে আলাদা হলেও এগুলো সবই দেখতে সাহায্য করে।

এখানে বলা যেতে পারে, কোনো পদার্থের একটি অণু বা এটমের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস, যার মধ্যে আছে প্রোটন ও নিউট্রন। সূর্য একটি নক্ষত্র, সেখানে প্রচণ্ড চাপে ও তাপে অবিরাম চলছে নিউট্রন প্রোটনের বিক্রিয়া। যার ফলে রচিত হচ্ছে ডিউটেরন নামক পরমাণুর কেন্দ্র (Nucleus), এতেও রয়েছে সেই একই প্রোটন ও নিউট্রন। ভারী পরমাণুকেন্দ্র নির্মাণে পর্যায়ক্রমে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভর রূপান্তরিত হয় শক্তিতে, যা আমরা পাই সৌরশক্তি হিসেবে।

আলো প্রধানত সূর্য থেকে আসে বলে সূর্যকেই গণ্য করা হয় আলোকের মূল উৎস হিসেবে। আর সূর্য থেকে আমরা যে প্রক্রিয়ার আলো পাই, তার মূল সূত্রধর কিন্তু অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু–জোনাকির চাইতেও যা বহুগুণ ছোট, প্রায় ১০ লক্ষ কোটি গুণ। এ কারণেই কবি জোনাকিকে বলেছেন– নিজেকে ছোট না ভাবতে। তাই যথার্থই বলা যায়, কী অসাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই না কবি দেখেছেন জোনাকিকে!

রবীন্দ্রনাথ বোধ করি তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার শক্তিতেই কাশ্‌ফের জগৎ থেকে এসব সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। আজ আমরা লেজার রশ্মির কথা জানি–আলো নাচে, আলো বাজে, আলো কাটে। আলো একটি সুইচের কাজ করে। কিন্তু এসব তো হালের কথা। রবীন্দ্রনাথ যেন ধ্যানলব্ধ জ্ঞানে গেয়ে উঠেছিলেন–

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে–
বাজে আলো বাজে ও ভাই, হৃদয় বীণার মাঝে–
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল-ধরা ॥

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা–
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি–
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা ॥

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

এই আলো হচ্ছে 'লাইফ অব দি ইউনিভার্স'। আলোর কম্পন, আলোর দ্যুতি, আলোর স্পন্দন–সমস্ত জীবকূল কিন্তু বেঁচে আছে এই আলো নিয়ে। সেজন্যেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আলোর প্রতি এক অপার্থিব আকুতি লক্ষ করা যায় তার আরেকটি গানে, সেখানে স্রষ্টার প্রতি তার প্রার্থনা– *আরো আলো, আরো আলো/ এই নয়নে, প্রভু, ঢালো*। বিজ্ঞানের সংশ্লেষ নেই যদিও, তবু প্রসঙ্গক্রমে বলি, এই গানেরই এক পর্যায়ে তিনি বলছেন– *আরো বেদনা, আরো বেদনা/ প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা*। অর্থাৎ বেদনার ভারে ও চাপে তিনি নুয়ে পড়েন নি, হতোদ্যম হয়ে যেতে চান নি, বরং এই বেদনার মধ্য দিয়েই আরো গভীরতর চেতনা লাভ করার বাসনা জানিয়েছেন স্রষ্টার কাছে।

যা-ই হোক, এরপর যে গানটির কথা বলছি, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেন অবতীর্ণ হয়েছেন দ্রষ্টার ভূমিকায়। যে মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল (Big Bang), তার জীবদ্দশায় এ তত্ত্ব প্রমাণিতই হয় নি। বিগ ব্যাং থিয়োরি অনুসারে, প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সব পদার্থ ও শক্তি ঘনীভূত ছিল একটিমাত্র বিন্দুতে, যা থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সূচনা ঘটে এই বিপুল সৃষ্টিজগতের। মহাবিস্ফোরণের পর পরই শুরু হয় বিকিরণ। ভর ও শক্তির সমতূল্যতার সূত্র অনুসারে সেই বিকিরণ রূপান্তরিত হয় পদার্থে। বিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর অর্থাৎ একের (১) পিঠে ৪৩টা শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যা হয়, এক সেকেন্ডকে তা দিয়ে ভাগ করলে যে সময়টা পাওয়া যায় (যা অকল্পনীয় এবং যাকে বলা হয় Planck's Time), তার আগের কোনো ঘটনাই বিজ্ঞানীদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। ফলে মহাবিস্ফোরণের মূল কারণ বিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তবে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন, তারা বলেন, এ-কাজ কেবল স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। আর রবীন্দ্রনাথের একটি গানে এ বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। গানের কথাগুলো হচ্ছে :

প্রথম আদি তব শক্তি–
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে ॥
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে ॥
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা,

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥

এ গানে কবি তার বিশ্বাসেরই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, সৃষ্টির প্রথম শক্তি বিধাতারই, গগনে গগনে পরমোজ্জ্বল জ্যোতি একমাত্র তাঁরই। বিশ্বসৃষ্টি এক মহাকাব্য এবং স্রষ্টাই এর রচয়িতা। তিনিই এর আদি কবি এবং মহাগুরু। কবি তার কল্পনা দিয়ে এখানে যেভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা বলেছেন, তা তার অনন্য সৃজনশীলতারই নিদর্শন।

এসব গানের মর্মকথা একদিন আলাপ করছিলাম আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সাথে এবং একটি টিভি চ্যানেলে সেদিন তিনি এ গানগুলো গেয়েও ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আমাকে বললেন, 'আজ ৩০ বছর ধরে গানগুলো গাইছি কিন্তু এর অন্তরালে যে এমন অপূর্ব বিজ্ঞান চেতনা ছিল তা-তো কখনো ভাবি নি।' সত্যি বলতে কী, শ্রোতা-শিল্পীদের বেশিরভাগই এটা নিয়ে ভাবেন না। ভাবলে তারা বিস্মিত হতেন। লাভ করতেন অনেক বাড়তি আনন্দও।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, জীবন ও পরিবেশ নিয়ে তার সহজাত সচেতনতাবোধ। পৃথিবীজুড়ে সর্বত্রই পরিবেশ দূষণ ও 'হিউম্যান ইকোলজি' অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে ভীষণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে, তর্কবিতর্ক হচ্ছে–কলকারখানা ও যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দেয়ার উপায় নিয়ে। আরো আলোচিত হচ্ছে আমাদের ঘরবাড়ির ধরন আর তার চারপাশে কেমন গাছপালা থাকা উচিত, গো-চারণভূমি না থাকার ফলে গবাদি পশুদের কী অসুবিধা হচ্ছে, জ্বালানির প্রয়োজনে দ্বিধাহীনভাবে বৃক্ষ নিধনের দরুন মরু-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগে ঠিক এ প্রশ্নগুলোই রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। তিনি পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে অনেক আগেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো ব্যবহার না করেও তিনি যে এর গভীরে ঢুকতে পেরেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কবিতায়। চৈতালি কাব্যগ্রন্থের *সভ্যতার প্রতি* কবিতায় পরিবেশ প্রসঙ্গে তার আবেদন ছিল–

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারন, সেই শান্ত সামগান ...

তাই এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, আধুনিককালে হিউম্যান ইকোলজির কথা সর্বপ্রথম যারা চিন্তা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের জগতে ঘটে গেছে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিষ্কার, যার প্রয়োগ ঘটেছে মহাশূন্য অভিযান ও কম্পিউটার প্রযুক্তিসহ নানা ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ-যুগের কবি-সাহিত্যিকরা এসব আবিষ্কার থেকে একটু যেন নিরাপদ দূরত্বই বজায় রেখেছেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হিসেবে হয়তো বলা যেতে পারে–অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও ব্যাধির কবলে জর্জরিত যে দেশের মানুষ, তাদের সাহিত্যে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তাৎপর্য প্রতিফলিত হবে–এটা আশা করা ঠিক নয়। এ যুক্তিতে যে জোর নেই, তা-ও নয়। তবে এ-ও সত্যি যে, বিজ্ঞানই আজ পৃথিবীজুড়ে দারিদ্র্যমোচনের পথ প্রশস্ত করেছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানবগোষ্ঠীর নবতর বিকাশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জীবদ্দশায় তিনি পারমাণবিক আগ্রাসনের কথা জানেন নি। মাইক্রো-ইলেকট্রনিকস কিংবা কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রবর্তন দেখে যান নি। শিল্পবিপ্লবের সময় বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোই প্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃথিবীজুড়ে কীভাবে প্রয়োগ করা হলো, রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তিনি দেশে দেশে ঘুরেছেন। এ সময় তিনি যেমন দেশ-কাল-ধর্ম ছাপিয়ে সর্বজাতির মানুষের মধ্যে এক সদাজাগ্রত সত্তার সন্ধান পেয়েছেন, তেমনি এসব মানুষের হাত-পাগুলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে চালাচ্ছে বা চালাতে পারে, তা-ও তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

তিনি একবার জাপান যাচ্ছিলেন। আজকের চীন তখনো গড়ে ওঠে নি। যাত্রাপথে হংকং বন্দরে চীনা মজুরদের 'কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে পুঞ্জিভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে' রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। তিনি লিখেছিলেন, 'এই এতোবড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সাথে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়'।

এই ভবিষ্যদ্বাণী তো আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। চীনের অভ্যুদয় ঠিকই ঘটল। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। এখানে যেটি লক্ষণীয় তা হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি একটি গভীর আস্থাবোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমন আশা সেদিন ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন।

জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। আজ আমরা জাপানকে বলে থাকি 'ওয়ার্কশপ অব দি ইস্ট' বা প্রাচ্যের কর্মশালা। ৮০ বছরেরও বেশি সময় আগে যখন রবীন্দ্রনাথের পা পড়ে জাপানের মাটিতে, তখনো এই কর্মশালা আজকের মতো অত্যাধুনিক হয় নি, তবু তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাদের কর্মপ্রাণ উদ্যম। কবির ভাষাতেই বলতে হয়–'এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল-কারখানা, আপিস-আদালত, আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়–তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে; য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমন করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যে খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে পড়ল না তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে–কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।'

দেশগড়ার কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, সে-বিষয়ে জাপান যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল তার এমন সঠিক উপলব্ধি ও চিত্রাঙ্কণ পৃথিবীতে নজিরবিহীন। তৃতীয় বিশ্বের বহু লোক আজ জাপান ভ্রমণ করছেন, জাহাজ নির্মাণসহ ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে তাদের দক্ষতা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছেন, কিছু শৌখিন যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে নিয়েও আসছেন, কিন্তু অ্যাডাপ্টিভ টেকনোলজি বা খাপ-খাওয়ানো প্রযুক্তি যে কীভাবে দেশগড়ার মন্ত্র হিসেবে কাজ করছে, সে-সম্পর্কে তাদের অনেকেরই ধারণা ততটা স্পষ্ট নয়। তাই শুধু ভ্রমণ নয়, মনের জানালা-দরজাগুলো খুলে দিয়ে বিজ্ঞানের আলো-বাতাসকে ঢুকতে দেয়ার যে মানসিকতা, তা থাকা চাই। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে সমসাময়িক অন্য মনীষীদের পার্থক্য।

শুধু জাপান নয়, রাশিয়াতে গিয়েও তিনি বিজ্ঞানের আয়োজনটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, 'শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়–মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে; সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।'

রবীন্দ্রনাথ যে 'শেষ-ফসল'-এর কথা বলেছেন তা এখনো বোনা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, তবে এক চরম উত্তেজনা আর প্রতিযোগিতার সাথে।

ইউরোপে গিয়ে সেই মহাদেশটা কীভাবে বিজ্ঞানের স্পর্শ দ্বারা সর্বদেশ ও সর্বকালকে স্পর্শ করেছে তা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন–'বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের...'। সার্বজনীন কবি রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে তুলে ধরার যে প্রয়াস পেয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে কবি যদিও বলেছেন–'মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান', তবু তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই ভেবে যে, 'এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন।' তার মতে, 'এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে–সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল–দেবত্ব পায়নি'।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

শান্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার যে উদাত্ত আহ্বান তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, তা আজও বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সবার কাছে উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই।

ইউরোপের ঔপনিবেশিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে ব্যথিত করেছিল। তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিলেন–ইউরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তবে এজন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো দায়ী করেন নি। এ ব্যাপারে তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তার মতে, 'যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে কোনো লাভ হবে না, থামাতে হবে লোভ। আর শুধু ধর্ম উপদেশ দিলে চলবে না, তার সঙ্গে চাই বিজ্ঞানের যোগ। যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক দিয়ে দমন করে সে সাধনা ধর্মের কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি আজ মিলনের অপেক্ষায় আছে।'

রবীন্দ্রনাথ যে মিলনের বাণী শুনিয়েছিলেন, তা আজও মানুষকে আশা দেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বসবাসকারী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজও পাশ্চাত্যের এই শুভবুদ্ধির অপেক্ষায় আছে। কবে তার উদয় হবে কে জানে।

শুধু বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানীর প্রতিও ছিল রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টি তা ছিল কখনো স্নেহ, কখনো ভক্তি আর কখনো শ্রদ্ধায় ভরা। এর দৃষ্টান্ত যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনেই দেখা যেত, তা নয়। তার সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার *ল্যাবরেটরি* নামক ছোটগল্পে দেখা যায়, সোহিনী মল্লিক নাম্নী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা প্রণাম করছেন সদ্য ডক্টরেট অব সায়েন্স ডিগ্রিধারী যুবক রেবতী ভট্টচার্যের পায়ে মাথা রেখে। যুবকের পা ছোঁয়ার ছল হিসেবে তিনি বলছেন, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমি ছত্রির মেয়ে... তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না'। রেবতী অবাক হয়ে বলেন, 'আমার মতো ব্রাহ্মণ!'। জবাবে সোহিনী বলেছিল–'আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালে সবসেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ'।

এখানে অবশ্য সেরা ব্রাহ্মণ বলতে সেরা বিজ্ঞানীকেই বোঝানো হয়েছে। রেবতীর হাতেই সোহিনী তার স্বামীর ল্যাবরেটরি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। গল্পে বোঝা যায়, সোহিনী কিছুটা ছলনাময়ী কিন্তু এই নারীর মুখেও

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীকে ব্রাহ্মণ হিসেবে চিহ্নিত করে হিন্দু মতাদর্শ অনুযায়ী তাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন। বিজ্ঞানীদের প্রতি এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর কী হতে পারে!

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিজ্ঞানের গতি, প্রকৃতি এবং এর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধেই চিন্তাভাবনা করতেন তা নয়। তিনি বিজ্ঞান জগতের নানা খবর নিজে জানার চেষ্টা করেছেন, আবার নিজে জেনে অন্যদের জন্যে সেটা লিখেও গেছেন। *বিশ্বপরিচয়* বরীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপ্রীতি ও বিজ্ঞানচর্চার একটা মহত্তম স্বাক্ষর। পরমাণুলোক থেকে শুরু করে নক্ষত্রলোক সৌরজগৎ গ্রহলোক ভূলোক–প্রতিটি জগতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এ বইটিতে। বহুদিন আগে লেখা বলে কিছু কিছু তথ্যকে সময়ের আলোকে একটু ঝালিয়ে নিতে হতে পারে মাত্র। কিন্তু লেখার মূল সুর অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন লোকে পদার্থের সংগঠনের যে হরেক রীতিনীতি, তা-তো অপরিবর্তিতই থাকবে।

বিশ্বপরিচয়-এ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ নজর দিয়েছেন ভাষার প্রতি। সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলোকে বোধগম্য করার কী সহজসাধ্য একটা প্রয়াসই-না এ বইটি! বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়–'বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য।' সে-কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব পরিভাষা এড়িয়ে ভাষার সহজতার দিকেই মন দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের *বিশ্বপরিচয়* সত্যিই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-মানসের কথা বলতেই সবার মনে *বিশ্বপরিচয়*-এর কথাই আগে জাগতে পারে। এই বইটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান ও চিন্তার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। তবে এটি তার বিজ্ঞান-মানসের সামান্য অংশের ওপরই আলোকপাত করে মাত্র। বড় অংশটাই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে তার কবিতা গান গল্প নাটক আর উপন্যাসে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব নানা উপকরণ কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-মানসকে সঠিক ছাঁচে ফেলা খুবই কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। তবে এতে রয়েছে অনাবিল আনন্দের অবকাশ।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনেও বিজ্ঞানকে পছন্দের একটি ক্ষেত্র

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

হিসেবেই গণ্য করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথকে তিনি কাব্যচর্চা নয়, বরং উৎসাহিত করেছিলেন কৃষিচর্চাতেই এবং উন্নত কৃষিবিদ্যা শিখে আসার জন্যে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন। এ-ছাড়া শান্তিনিকেতনে যে-সব প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি পল্লীমঙ্গলের কথা ভাবতেন তা দেশজ প্রযুক্তির প্রতি তার গভীর আস্থাই ব্যক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ও স্রষ্টাবন্দনা

যে ধ্যানে রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী মগ্ন ছিলেন, প্রকৃতি ও স্রষ্টাপ্রেমই তার মূল উপজীব্য। প্রকৃতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত তো আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি, আর স্রষ্টাপ্রেমের পরিচয় মেলে তার কবিতায় ও গানে। *গীতাঞ্জলি* স্রষ্টাবন্দনার এক অসাধারণ রূপ। এ অনবদ্য সাহিত্যকর্মের জন্যেই তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

আমরা প্রথম দেখব প্রকৃতিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমগ্নতার বিষয়টি। উদ্ভিদ নিয়ে যে গীত তিনি রচনা করেছেন তার জুড়ি নেই। এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।'

এ যে শুধু ভাবের কথা তা নয়। এর মধ্যেই ধরা পড়েছে বৃক্ষের নীরব লীলা বোঝার প্রয়াস, যা আরো মূর্ত হয়ে ওঠে তার *বনবাণী* কাব্যগ্রন্থের *বৃক্ষবন্দনা* কবিতায়–

> *অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান*
> *প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ*
> *ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা*
> *ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা*
> *নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।*

আলো সাত রংয়ের বর্ণালি। এর প্রতিটি রংয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা। বৃক্ষের ওপর যখন সৌরশক্তি এসে পড়ে তখন সালোক-সংশ্লেষণের জন্যে সে আলোর সবগুলো তরঙ্গ ব্যবহার করে না, কিছু বাদ দিয়ে করে। অর্থাৎ আলোর মধ্যে কী লুকিয়ে আছে বৃক্ষ তার খবর রাখে, এর কতটুকু তাকে নিতে হবে, তা-ও সে জানে, যদিও বৃক্ষের এই আলোকতরঙ্গ বাছাইয়ের

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

খবর বিজ্ঞানীকে বুঝতে হয়েছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু গাছকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

...সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যালোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।

রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষের এই গোপন কথা জেনেছিলেন বোধ করি তার গভীর 'ধ্যানবল'-এর মাধ্যমে। একই কবিতায় তাই তিনি বলছেন :

...ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টি যজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ, ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;

এই চরণ ক'টিতে কবি গীতিময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন–বৃক্ষ কী করে সূর্যশক্তিকে আটকে রেখেছে তার দেহের স্তরে স্তরে। প্রায় শতাব্দীকাল আগে রবীন্দ্রনাথ সূর্যরশ্মিপায়ী বৃক্ষমজ্জাতে যে তেজের কথা লিখেছিলেন, আজকের জ্বালানি-সংকট কবলিত বিশ্ব কিন্তু নতুন করে সেই তেজের কথাই বলতে শুরু করেছে!

বৃক্ষের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে 'ধ্যানবল'-এর কথা লিখেছেন, সুফিদের ভাষায় তাকেই বলা যেতে পারে 'কাশ্‌ফ', যার মাধ্যমে সুফি কবিরা কিছু সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছান। বিজ্ঞানীরা একই সত্যে উপনীত হন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

এখানে উল্লেখ্য, কবি শেখ সাদীও বোধ করি 'ধ্যানবল'-এর মাধ্যমে বৃক্ষের গোপন কথা জেনেছিলেন : *বার্গে দরখতখানে সব্‌জ/ দার নাজায়ে হোঁশিয়ার/ হার ওরাকে দাফতারিস্ত/ মারাফাতে কারদেগার ..*। যার বাংলা মর্মার্থ দাঁড়ায়–হুশিয়ার অর্থাৎ সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি যদি সবুজ বৃক্ষের ওপর পড়ে তবে সে এর প্রতিটি পাতায় দেখতে পাবে একটি দফতর, যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কারিগরের গুপ্তজ্ঞান। সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আসলেই

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

পরম স্রষ্টার গুপ্তজ্ঞানের এক উদাহরণই বটে, যা আমরা বিজ্ঞানীরা আজও পুরোপুরি জেনে উঠতে পারি নি।

এবার স্রষ্টাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের কথা বলব। এ ধ্যানের কোনো তুলনা নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন স্রষ্টার মাহাত্ম্য। আর এ নিয়ে যা তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা প্রকাশ করেছেন তার বহু কবিতায়, গানে। তেমনি একটি গানের কথা হলো :

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুখজালা সেই পাশরে–
সব দুখজ্বালা সেই পাশরে ॥
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে।

বিশ্বপ্রভুর ধ্যানে যে মাধুরী, তা-ই প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে ও *গীতাঞ্জলি*-তে স্রষ্টাবন্দনায়। এখানে পরম স্রষ্টাকে পাওয়ার আকুতি থেকে একদিকে তিনি নিজের ঘর আবিষ্কার করার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তার সকল অহংকার বিনাশের কথা বলেছেন। নিজের ঘরের কথাটাই প্রথমে বলি। তিনি গাইছেন : *যাব না গো যাব না যে, রইনু পড়ে ঘরের মাঝে–/ এই নিরালায় রব আপন কোণে/ ..আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে/ আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে..*।

এই ঘর ধোয়া-মোছাটাই কিন্তু ধ্যানের একটি বড় কাজ। মেডিটেশনে আমাদের যে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে বলা হয়, সেটা আত্ম উপলব্ধির ঘর। নিজেকে চেনার, জানার ও ফিরে পাওয়ার ঘর। এমন ঘর তৈরি করে সারাজীবন কবি অপেক্ষায় ছিলেন পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের।

সেইসাথে নিজের সকল অহংকারকে দূর করার সাধনা করেছেন তিনি প্রতিনিয়ত। স্রষ্টার কাছে তিনি মিনতি করেছেন এই বলে–*আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।/ সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥/ নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলই করি অপমান/ আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া/ ঘুরে মরি পলে পলে*।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

গীতাঞ্জলি-র আরেকটি গীতে কবি গাইছেন : *নামাও নামাও আমায় তোমার/ চরণতলে,/ গলাও হে মন, ভাসাও জীবন/ নয়নজলে।/ একা আমি অহংকারের/ উচ্চ অচলে,/ পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও,/ ভাঙ্গো সবলে।/ নামাও নামাও আমায় তোমার/ চরনতলে।/ কী লয়ে বা গর্ব করি/ ব্যর্থ জীবনে।/ ভরা গৃহে শূন্য আমি/ তোমা বিহনে।/ দিনের কর্ম ডুবেছে মোর/ আপন অতলে/ সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন/ যায় না বিফলে।/ নামাও নামাও আমায় তোমার/ চরনতলে।*

গর্ব করার মতো কতকিছুই না কবির ছিল, তা আমরা জানি। তাই কবি যে কথাগুলো বলেছেন তা কেবল তার বিনয়ের কথা, কারণ বিনয় ছাড়া বন্দনা হতে পারে না। আমরা যখন মনের ঘরে ঢুকতে যাই তখন এই বিনয় অর্থাৎ নিরহংকারের সাথেই ঢুকতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত অর্থে ধ্যানমগ্ন হতে হবে।

স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্য, সৃষ্টিজগতে বিরাজমান অনবদ্য ঐকতান ও সিম্ফনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করেছেন, তা তিনি বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। নানা সুরে ও বিনম্র ভঙ্গিতে।

১৯১৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত *গীতাঞ্জলি*-র ইংরেজি অনুবাদের (Song Offerings) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন বিশ শতকের প্রখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস। ওখানে তিনি বলেন, '... এখানে পথিক গেরুয়া বসন পরিধান করে গায়ে ধুলো লাগলে বোঝা যাবে না বলে, যুবতী তার শয্যায় তার প্রেমিক রাজপুত্রের মালা থেকে খসে পড়া পাপড়ি খোঁজে, ভৃত্য বা বধূশূন্য গৃহে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করে, এসবই ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হৃদয়ের প্রতীক। ফুল আর নদী, শঙ্খধ্বনি, ভারতীয় ঘন বর্ষা অথবা তপ্ত নিদাঘ, এগুলোও মিলনের বা বিরহের বিভিন্ন মেজাজের প্রতিচ্ছবি; আর নৌকোর ওপর বসে যে ব্যক্তিটি বাঁশি বাজান—রহস্যময়, অর্থব্যঞ্জক চীনা চিত্রপটের মতো, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ...।'

এভাবেই হৃদয়-নিঃসৃত নন্দিত সাহিত্যবাণী দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্রষ্টার দিকে চিরধাবমান, যার অনন্য সাহিত্যরূপ এই *গীতাঞ্জলি*। ইসলামিক পরিভাষায় স্রষ্টাবন্দনাকে অভিহিত করা হয় 'হামদ' নামে। *গীতাঞ্জলি*-র এই 'হামদ'-ই জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্ববাসীর মন কেড়েছে শত বছরেরও বেশি সময় ধরে। কবি এতে যা রচনা করেছেন, তা হলো স্রষ্টার প্রতি এক সমর্পিত বান্দার হৃদয়ের নৈবেদ্য।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেন দেখি সামগ্রিকরূপে, খণ্ডিতরূপে নয়। তাহলেই তার বিজ্ঞান চেতনা, সার্বজনীন প্রেম এবং তার ধ্যান ও স্রষ্টাবন্দনা থেকে জীবন-জগৎ সম্বন্ধে আমরা একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারব। আজকের এই শশব্যস্ত কোলাহলময় জীবনে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্যে হলেও যদি বিনয় ও দীনতার সাথে ধ্যানমগ্ন হয়ে আমরা বিশ্বস্রষ্টার করুণাকে অনুভব করতে পারি, সকল প্রাপ্তির জন্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বন্দনা করতে পারি, তবে স্রষ্টাকে আমরা পাব আমাদের সকল শুভ-উদ্যোগের সঙ্গী হিসেবে ও দিশারী হিসেবে এবং সেটাই হবে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম পাওয়া।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ আলোচনা, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭

(উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ১২০ তম বন্ধুত্ববার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও জগদীশ চন্দ্র বোস ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ। সেখানে মূল প্রবন্ধ হিসেবে এটি পাঠ করেন ড. এম শমশের আলী।)

speech.quantummethod.org.bd

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর,
বিশিষ্ট আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষক ও লেখক।
দেশের একাধিক শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে
গুরুদায়িত্ব পালনকালে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও
সর্বসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে
বরাবরই তার নৈতিক দৃঢ়তা সর্বমহলে
ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

event.quantummethod.org.bd

শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

নদী পার হতে নৌকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু নৌকার ভেতরে যদি পানি ঢুকতে শুরু করে তবে নৌকা তো চলবে না, পানিতে ভেসে চলার পরিবর্তে ডুবে যাবে। তেমনি এই পৃথিবীতেও আমাদের দেহটা হলো নৌকা। এর ভেতরে যেন দুনিয়া প্রবেশ না করে, করলেই বিপত্তি। এটা বলে গেছেন মহাকবি শেখ সাদী।

ব্যাপারটা আমরা আরেকটি ঘটনার মাধ্যমে বুঝতে পারি। হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর (র) ঘটনা। একবার তার এক খাদেম এসে জানালেন–হুজুর একটা দুঃসংবাদ! আমাদের মালপত্র বোঝাই একটা জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে, ফলে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। শুনে তিনি বললেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

দুদিন পর আবার খবর এলো–ঝড় উঠেছিল ঠিকই কিন্তু জাহাজডুবি আর হয় নি। ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে। এবারও তিনি বললেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! খাদেম মহাবিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলেন–হুজুর! আজ ভালো খবর দিলাম, আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ। ঐদিনের খারাপ খবরেও একইরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। শোকরগোজার ছিলেন। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দয়া করে।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) বললেন, তুমি যখন একটা খারাপ সংবাদ দিলে তখন আমি মনকে জিজ্ঞেস করলাম–মন, তুই কি কষ্ট পেয়েছিস? মন বলল, না। আজ ভালো খবর শুনে আবার জিজ্ঞেস করলাম–

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মন, তুই কি খুশি হয়েছিস? বলল, না। অর্থাৎ লোকসান হলেও আলহামদুলিল্লাহ, লাভ হলেও আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় এই শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়।

পরশ-পাথর কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দরিদ্র পরিবারের কথা তুলে ধরেছেন। সেই পরিবারে স্ত্রী একদিন স্বামীকে বলল, পরশ-পাথর বলে একটা পাথর আছে যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। দেখ তো খুঁজে পাও কিনা।

তো, স্বামী খুঁজতে বেরোল; কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না পরশ-পাথর। একদিন মরুভূমির মধ্যে দেখল, এক সাধু তপস্যা করছেন। সে বলল, বাবা আমার একটা পরশ-পাথর দরকার। কোথায় পাব? শুনে সাধু তার থলে থেকে একটা পাথর বের করে বললেন যে, এটা?

সত্যিই তা-ই হলো। পাথরটি যেই লোহাতে ছোঁয়ানো হলো অমনি দেখা গেল, ওটা সোনা হয়ে গেছে। সে মহাখুশিতে এক দৌড় দিল তার বাড়ির দিকে। কিছুদূর গিয়ে তার মনে হলো—আমাকে পরশ-পাথর এমনি এমনি দিয়ে দিল! তার মানে ঐ সাধুর কাছে নিশ্চয়ই আরো মূল্যবান কোনো জিনিস আছে। সে আবার গেল সাধুর কাছে।

কবিতার একপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আত্মনিমগ্নতার মধ্য দিয়ে সত্যিই সেই সাধু পরশ-পাথরের চেয়েও মূল্যবান কিছু পেয়েছিলেন। আর তা হলো সত্যজ্ঞান।

তাই আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞান ও শিক্ষা এক নয়। প্রচলিত শিক্ষা না পেয়েও একজন মানুষ জ্ঞানী হতে পারেন। আত্মনিমগ্নতার পথ ধরেই মুনি-ঋষি, সুফিসাধক ও সন্ন্যাসীরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃত মানুষ হতে হলে প্রয়োজন এই আত্মনিমগ্নতা।

মুক্ত আলোচনা, ২ জুলাই ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

শোকরগোজার মনই প্রশান্ত মন।
প্রশান্ত মন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে
করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে; সহজেই সংযুক্ত
হয়ে যায় শক্তির মূল উৎসের সাথে–
যেখান থেকে উৎসারিত হয়
সাফল্যের ফল্গুধারা।

সুসংবাদ কিংবা দুঃসংবাদ–
দুটোই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন।
প্রকৃতিতে এমন কিছু ঘটে না, যার কোনো
যৌক্তিক বা সুদূরপ্রসারী কারণ থাকে না।

অধ্যাপক রফিকুন্ নবী (রনবী)।
খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট। জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র 'টোকাই' তারই সৃষ্ট। বহুমুখী সৃজন-প্রতিভা ও অর্ধশতাব্দী-কালব্যাপী শিল্পসাধনায় তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের চিত্রকলার ভুবনকে।
দীর্ঘ পাঁচ দশকের শিক্ষকতা-জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং চারুকলা অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চারুকলার ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বিভাগের সুপারনিউমেরারি অধ্যাপক।

event.quantummethod.org.bd

জানতে হবে নিজের দেশ, মানুষ ও সংস্কৃতিকে

র ফি কু ন্ ন বী

আমি তখন বেশ ছোট। প্রতিবেশী দারোগা সাহেবের ছেলেটি ছিল আমার খুব কাছের বন্ধু। একসাথে খেলতাম। আমরা ছিলাম প্রায় একই বয়সী। হঠাৎ একদিন দেখি এ হিন্দু পরিবারটি নেই। তারা ভারতে চলে গেছে। আমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল সেদিন।

ওরা ভারতে চলে গেল কেন? আর কোনোদিন ফিরবে না? এমনই কত প্রশ্ন তখন আমার মনে। ঐ বাসাতেই নতুন দারোগা এলেন ভারত থেকে। এ পরিবারটি মুসলমান। তাদের ছোট বাচ্চাটিও আমারই বয়সী। তবু মানুষগুলো তো আর এক নয়। ছোটবেলায় এ ঘটনা সাংঘাতিক দাগ কেটেছিল আমার মনে।

সে-সময় আমরা গ্রামের বাড়িতে যেতাম ব্রডগেজ ট্রেনে। যাওয়া-আসার পথে দেখতাম অগণিত মানুষের ভিড়। মুসলমান পরিবারগুলো ভারত থেকে চলে আসছে আমাদের দেশে। আর হিন্দু পরিবারগুলো চলে যাচ্ছে ভারতে। তখন দেশভাগ কী আর কেনই-বা হলো, এসব আমি কিছুই বুঝি না।

১৯৪৭-এ দেশভাগের আগের ঘটনা মনে পড়ে। আমার বাবা তখন পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন ফতুল্লা থানায়। আমার বয়স তখন চার। সে-সময় আমাদের গ্রামের সব মানুষ একত্র হয়ে নাটক দেখত। ব্রিটিশবিরোধী নাটক *সিরাজউদ্দৌলা*। দেখতাম সিরাজউদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করছেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক। হিন্দু-মুসলমান বৈরিতার কথা আমরা পরবর্তীকালে শুনেছি কিন্তু এগুলো কিছুই দেখি নি।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমার দাদাও ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পারিবারিক চাপের মুখে আমার বাবা চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হলেন। অথচ বাবার ছিল ছবি আঁকার শখ। কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেও ভর্তি হতে পারলেন না। আমি দেখতাম–প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি ছবি আঁকতেন।

বাবা স্লেট-পেন্সিল দিয়ে আমাকে দেখাতেন হাতি কীভাবে আঁকতে হয়, পাখি কীভাবে আঁকতে হয়। আমি বাবার মতো সুন্দর করে আঁকতে চেষ্টা করতাম। এভাবেই ছবি আঁকার প্রতি ধীরে ধীরে আমার মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হতে থাকল।

আঁকার প্রতি ভালোলাগা থেকেই আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। তবে আমার চেয়েও এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ বাবারই ছিল। ১৯৬৪ সালে আমি ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম এবং আমার রেজাল্ট বেশ ভালো হলো। রেজাল্টের দিনই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন।

স্যার আমাকে চারুকলায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে বললেন। কিন্তু থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়েই আমি অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশনসে খণ্ডকালীন কাজ শুরু করি। ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষে ওখানেই কাজ করব, বড় প্রচ্ছদশিল্পী হবো। তবে শেষ পর্যন্ত আবেদিন স্যার আর বাবার কথা আমি ফেলতে পারি নি। বৃহস্পতিবার রেজাল্ট হলো আর সোমবার আমি চারুকলায় যোগদান করলাম।

ছাত্রজীবন থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নানান কিছু দেখেছি। দেশ নিয়ে আমাদের মধ্যে তখন নানান অনুভূতি-উপলব্ধি তৈরি হচ্ছে। কেন মানুষ মুক্তি চায় তা যেন আমরা একটু একটু করে বুঝতে পারছি। ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের দেশে একটার পর একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছিল, তার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে শিল্পীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমরা তখন মিছিলের জন্যে কার্টুন পোস্টার এঁকেছি। আমাদের চিন্তা ছিল– ৫০০ জন মানুষ মিছিলে থাকবে, প্রত্যেকের হাতে যেন একটা করে ব্যানার থাকে, ফেস্টুন থাকে, পোস্টার থাকে।

এসব আয়োজন নিয়ে চারুকলা তখন সাংঘাতিক ব্যস্ত। আমরা ছড়ার বই বের করলাম *৬৯-এর ছড়া*। বিখ্যাত হয়ে গেল বইটি। এই কাজগুলো আর্টিস্টরাই করেছিল। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এসব আন্দোলন ধীরে ধীরে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। এভাবেই আমাদের একটা বৈরি সময়ের মধ্য দিয়ে শিল্পকলা চর্চা করতে হয়েছে, যা সহজ ছিল না মোটেই।

শিল্পী হিসেবে আমি ভাবতাম—রোমান্টিক ছবি আঁকব, প্রকৃতি আঁকব, মানুষ আঁকব। কার্টুন আঁকব এমন কথা কখনো ভাবি নি। দেশ, কাল ও চারপাশের অবস্থা চিন্তা করে কার্টুনচর্চার সাথে আমার সম্পৃক্ততা। মিছিলের জন্যে কার্টুন আঁকা শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পত্রিকায় কার্টুন আঁকতাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, অনেক আগে একটি ছোট্ট পথশিশুকে নিয়ে আমি এমনই কার্টুন করতাম। হাস্যরসাত্মক কার্টুন। ভাবলাম, ওদের মধ্য থেকে একটা চরিত্র ঠিক করি এবং তার একটা নাম দিয়ে দেই।

শুরু করলাম *টোকাই* নাম দিয়ে। টোকাই একসময় আমার চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সবকিছুই উঠে আসত টোকাই-এর বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস মন্তব্যে। আসলে আমরা শিল্পীরা কি আমাদের দেশকে ভুলে কিছু করতে পারব? অন্য কিছু ভাবতে পারব? পারব না। অতএব দেশকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

দীর্ঘ শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি, শিল্পী হওয়াটা আসলে দুরকমের। ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মালে একরকম। তথাকথিত ট্যালেন্ট নেই, অথচ শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে আর্ট কলেজে এসেছে—তাকে দিয়েও হবে। তবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে।

শিল্পী হিসেবে আমারও নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। আমাকে সহযোগিতা করেছে দেখা, শোনা ও জানার আগ্রহ। একজন শিল্পীকে তার দেশ, দেশের মানুষ-সংস্কৃতি-পরিবেশ সবকিছু সম্পর্কে জানতে হবে। চারপাশকে গভীরভাবে দেখা ও শোনার দক্ষতা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেননা সবমিলিয়েই আমাদের জীবন। আর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

মুক্ত আলোচনা, ৭ মে ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

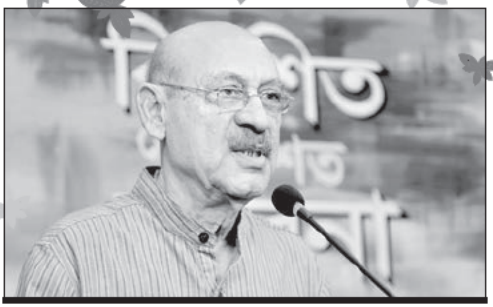

আবুল হায়াত।
বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব। গত পাঁচ
দশকেরও বেশি সময় ধরে তার স্বতঃস্ফূর্ত
অভিনয় দক্ষতা দেশের সব প্রজন্মের দর্শকের
কাছে তাকে করে তুলেছে বহুল জনপ্রিয়।
একুশে পদকসহ নানা সম্মাননায় ভূষিত
এই গুণীজনের সাহিত্যভুবনও বেশ সমৃদ্ধ।
কবিতা, স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস, কলাম-
সংকলন মিলিয়ে এ-যাবৎ প্রকাশিত
তার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৩০।

event.quantummethod.org.bd

বিরামহীন কাজ করার জন্যে চাই সুস্থতা

আবুল হায়াত

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় একটি নাটক ছিল *বহুব্রীহি*। সেই নাটকে আমি 'সোবহান সাহেব' নামে এক দানশীল ও হৃদয়বান ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম, যিনি মানুষকে বিপদে-আপদে সাহায্য ও আশ্রয় দেন। নাটকটা যখন প্রচার হচ্ছিল, সে-সময় একদিন বাজারে গিয়েছি। এক বৃদ্ধ ভিখারিনি এগিয়ে এসে সাহায্য চাইলেন। কিছু দেবো না বলে দিলাম; কিন্তু তিনি পিছু ছাড়লেন না, টাকা চাইতেই লাগলেন। একসময় তার সব উপরোধ-আকুতি উপেক্ষা করে আমি যখন বাজার শেষে গাড়িতে উঠতে যাব তখন পুনরায় তার কাতর অনুরোধ—'একটা টেহা দ্যান না বাবা।'

এবার কিছুটা ধমকে উঠলাম—'এই যান তো যান। টাকা দিতে পারব না, যান!' আমার বিরক্তি দেখে মহিলা হতভম্ব। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'টিভিতে দেহি কত মাইনষেরে কত টেহা দেন, আমারে এই একটা টেহা দিতে এত কষ্ট!'

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। ঘটনাটা আমাকে বেশ নাড়া দিল। অভিনয়ের শক্তিটা নতুন করে উপলব্ধি করলাম। এজন্যেই আমি নাটক রচনার ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করি না। যেমন, শাশুড়ি বা পুলিশের চরিত্র। কারণ অধিকাংশ দর্শক একেই বাস্তব হিসেবে ধারণা করে বসে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

আমার শৈশব কেটেছে চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনিতে। তখন মা-বাবার সাথে বিভিন্ন নাটকের আসরে যেতাম। এভাবেই নাটকের প্রতি ভালবাসা

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

জন্মে। ১০ বছর বয়সে বন্ধুদের নিয়ে *টিপু সুলতান* নাটকে অভিনয় করি। তারপর স্কুল কলেজ কলোনির অনুষ্ঠান–অভিনয়ের কোনো সুযোগই কোথাও হাতছাড়া করি নি। সবার মুখে শুনতাম একটা কথা–এই ছেলের অভিনয় তো অভিনয়ই মনে হয় না! আমার খুব মন খারাপ হতো কথাটা শুনে। এটা কি প্রশংসা নাকি অন্য কিছু বুঝতাম না। এদিকে অভিনয়ের নেশাও পেয়ে বসেছে। বুয়েটে পড়াকালীন ভার্সিটির কোথাও নাটক হয়েছে আর আমি অভিনয় করি নি, এমনটা কখনো হয় নি।

১৯৬৭ সালে বুয়েটে পড়াশোনা শেষ হলো। প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিলাম ঢাকা ওয়াসায়। সেটাও নাটকের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুবিধার্থেই, কারণ ঐ চাকরিতে ঢাকার বাইরে বদলি নেই।

এর মধ্যে জিয়া হায়দারের নাম শুনলাম। তিনি *নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়* নামে একটি নাট্যদল গঠন করতে যাচ্ছেন। আমি যথারীতি যুক্ত হলাম। ওখানে গিয়ে বুঝলাম–আগে যা করেছি সবই না বুঝে, না জেনে। ভেতর থেকে যা এসেছে তা-ই করেছি। কিন্তু জিয়া হায়দার, আমার নাটকের শিক্ষাগুরু, তিনিই প্রথম শেখালেন প্রকৃত অভিনয়টা আসলে কী। তিনি বলতেন, অভিনয় না করাটাই শ্রেষ্ঠ অভিনয়। আমার অভিনয় যে অভিনয়ই মনে হয় না, তা শুনে কষ্ট পেতাম। নাগরিকে গিয়ে বুঝলাম–ওটা স্রষ্টাপ্রদত্ত গুণ। আমি স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ, এই গুণটা আমার সহজাত। সেই থেকে আমি সবসময় এটাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

এভাবেই আমার নাট্যচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সেই সময়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি আমরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। পশ্চিমা অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমরা শহীদ মিনারে, মাঠে-ময়দানে, রাস্তাঘাটে নাটক করতাম।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আমাদের একটি নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ছিল–*রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য*। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। একপর্যায়ে কোমায় চলে গেলাম। কোমা থেকে ফেরার পর দেখি হাসপাতালে আমি একা শয্যাশায়ী। ডাক্তার-নার্স কেউ নেই। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম আমার মেয়ে বিপাশা জন্মগ্রহণ করেছে, সে আমার স্ত্রীর সাথে গ্রামের বাড়িতে আছে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারার বেদনা তো ছিলই, তার চেয়ে বেশি যা আমাকে ব্যথিত করল, সেটা হলো, প্রফেসর ডা. ফজলে রাব্বীর মৃত্যু।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

১৫ ডিসেম্বর স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে তিনি অপহৃত ও নিহত হন। মাসকয়েক আগে তার চিকিৎসাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রেও অভিনয় শুরু করি। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। ছবিটা ছিল বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*।

পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে আমি কিছু নাটক নির্মাণ করেছি। শিশুদের মনটাকে বুঝতে চেয়েছি। আমরা শিশুদের বুঝি না, কারণ বুঝতে চাই না। ওদের ওপর জোর খাটাতে গিয়ে নানা মানসিক চাপ সৃষ্টি করি। এ ব্যাপারে আমি সচেতন হয়েছি আমার বাবাকে দেখে। তিনি ছিলেন সব্যসাচী মানুষ। বিচিত্র বিষয়ে ছিল তার জ্ঞান ও আগ্রহ। তিনি আমাকে বাগান করা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা শিখিয়েছেন। কিন্তু কখনো কিছু চাপিয়ে দেন নি।

যে শিশুদের নিয়ে আমি কাজ করেছি তারা অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। জীবনের এ পর্যায়ে এই কাজগুলোই আমি করতে চাই। নিজে যা শিখেছি, যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা ছড়িয়ে দিতে চাই। এই বিরামহীন কাজ করে যাওয়ার জন্যে দরকার সুস্থ থাকা।

নিজেকে সুস্থ রাখতে আমি কিছু বিষয় মেনে চলি। বাইরের কোনো খাবার বিশেষত ফাস্টফুড খাই না। ফাস্টফুড ও চিনি, দুটোই কিন্তু বিষ। চিনির উৎস হতে পারে ফল। বাংলাদেশের ওপর স্রষ্টার বিশেষ রহমত– আমাদের এত বিচিত্র সব ফল রয়েছে, যে সময়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই ঋতুর রোগের প্রতিষেধকও সেই ফল।

আর একটা কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি–আমার কাজ ও পরিবার নিয়েই আমার জীবন। কাজের বাইরে যতটুকু সময়, সেটা আমার পরিবারের। আমার জীবনে কোনো আড্ডা বা ক্লাব কিছুই নেই।

কোয়ান্টামের একটা কথা আমার বেশ পছন্দের–*রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন*। ব্যক্তিগত জীবনেও এটা প্রয়োগ করে আমি লাভবান হয়েছি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজে বিশেষ অবদান রাখছে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে বহু মানুষ যোগ দিয়েছে কোয়ান্টামের এই মিলনমেলায়। এখানে এসে প্রশান্ত হওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করেন। এতে তিনি যেমন উপকৃত হচ্ছেন, এগিয়ে যাচ্ছে জাতিও।

মুক্ত আলোচনা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

আসাদুজ্জামান নূর।
বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
প্রাক্তন সংস্কৃতিমন্ত্রী।

event.quantummethod.org.bd

সন্তানকে বড় করুন উদারনৈতিক পরিবেশে

আ সা দু জ্জা মা ন নূ র

আমার বাসার কাছে একটা স্কুল আছে। রোজ সকালে বারান্দা থেকে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী–বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিন তলা বাড়ি। ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

এই শিশুটি দুপুরে বাড়ি ফিরলে মা হয়তো বলে–গোসল করো, খাও, ঘুমাও। তারপর হোমওয়ার্ক। ওটা শেষ করেও তার বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ফলে সে কার্টুন দেখে, তা-ও হিন্দি ভাষায়। এই বাচ্চাটি যদি সকালে বলে ওঠে–'মা, মুঝে নাশতা চাহিয়ে, স্কুল যানা হ্যায়', তাকে দোষ দেয়ার কিছু নেই। সে যা দেখছে ও শুনছে, তা-ই শিখছে।

পরদিন আবার স্কুলে যাওয়ার জন্যে সে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়। অর্থাৎ ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এই হলো এখন একটা বাচ্চার জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেল নিয়ে ব্যস্ত। এভাবে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই বাচ্চারা যখন আরেকটু বড় হবে তখন শুরু হবে 'জিপিএ ফাইভ নির্যাতন'। গোল্ডেন জিপিএ না পেলে যেন জীবন বৃথা। কিন্তু বোঝার চেষ্টা করতে হবে–যে ছেলেটা ভালো ফল করছে না, তার কেন পড়তে ভালো

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

লাগছে না? নাকি আমিই ঠিকমতো ওকে শেখাতে পারছি না? ও কি ছবি আঁকতে চায়? গান গাইতে চায়? নাকি খেলতে চায়? গাক না একটু গান! খেলুক না একদিন। তাহলে পড়াটাও তার কাছে আনন্দময় হবে। আর যদি ভীতিকর হয় তাহলে তো পড়তে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক।

ক্লাসে সবাই ফার্স্ট-সেকেন্ড হবে না। যারা হবে না, তারা কি দেশের কোনো কাজে লাগবে না? তাহলে কি ওদের একটা জাহাজে তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসব? সবার মধ্যে শক্তি আছে। আমরা সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি না, বরং নিজেদের মতটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেই। কিন্তু যারা কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন চর্চা করেন, তারা এই শক্তিতে বিশ্বাস করেন বলে আমি জানি।

একেকজনের চাওয়া একেক রকম। সেই চাওয়াটা নিশ্চিত না করে নিজের চাওয়াটা সন্তানের ওপরে চাপিয়ে দিলে তার বিকাশটা হবে কীভাবে? শুধু বইয়ের কিছু শুকনো পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কখনোই একজন মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হওয়ার জন্যে তাই সংস্কৃতিবান হতে হবে।

একবার এক মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, চিত্রকলা শিখিয়ে কী হবে? আমার ছেলে কি জয়নুল আবেদিন হবে? আপনারা খেলাধুলার পেছনে সময় দিতে বলেন। এতে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয়। আমি জানতে চাইলাম, তিনি কী চান। তিনি বললেন, আমার সন্তান ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো চাকরি পাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি বললাম, সেটা আমরা সবাই চাই। আমিও চাই আমার সন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াক। তার সুন্দর একটা জীবন হোক।

তবে শুধু পরীক্ষার রেজাল্টের ওপরে সাফল্য আসে না। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। কিন্তু সেজন্যে জীবনের সবকিছু বাদ দিয়ে উঠেপড়ে লাগলে পরিণাম ভালো হবে না। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেন নি। বাড়িতে পড়াশোনা করেছেন। কুস্তি করেছেন, গান শিখেছেন। আর জাতীয় কবি কাজী নজরুল তো স্কুলে যাওয়ারই সুযোগ পান নি। অথচ তাদের বই পড়েই তো আমাদের জিপিএ ফাইভ পেতে হচ্ছে!

সেই অভিভাবককে আরো বললাম, আপনি নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন। তিনি যেখানেই যেতেন তার হাতে একটা বাক্স থাকত, তাতে থাকত একটা বেহালা। তার মতো জগদ্বিখ্যাত

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বিজ্ঞানীর যদি বেহালা বাজানোর সময় থাকে, তাহলে আমরা সন্তানদের এমন কী মহাপণ্ডিত বানাচ্ছি যে, তার গান শেখার, কবিতা পড়ার বা খেলার সময় হচ্ছে না? তাহলে ওর জীবনের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি ঘটবে কীভাবে? সে-তো মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। আর রোবটের মতো করে তৈরি করলে সন্তানের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্ম না হয়ে অমানুষের জন্ম হতে পারে। কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপার। আমাদের দেশটা একটা ফুলের বাগানের মতো করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। ফুলের বাগানে যেমন নানা রঙের ফুল থাকে, এদেশটাও তা-ই। এখানে আছে নানা ধর্মের মানুষ, আছে সমতল ও পাহাড়ের মানুষ। আমরা একসাথে সুন্দরভাবে থাকতে চাই। সেজন্যে আমাদের সন্তানদের বড় করতে হবে উদারনৈতিক পরিবেশে।

একটা ঘটনা বলি। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হওয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, আমি রাজনীতির মানুষ, আমি তো সাহিত্যের কিছু বুঝি না। তোমরা বড় কোনো সাহিত্যিককে অতিথি করো। তখন সবাই মিলে তাকে বোঝালেন, আপনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান ও জাতির পিতা। আপনি এলে সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে। আমি যাব। কিন্তু মঞ্চে আমার পাশে তিন জন বসবেন–পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং বিজ্ঞানী প্রফেসর মতিন চৌধুরী। বাংলা একাডেমির সাহিত্য জাদুঘরে সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এখনো আছে।

এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে যে বার্তাটি দিয়েছিলেন, তা হলো, পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ গড়তে একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানীকেও থাকতে হবে। আমরা যদি এভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আমরা পৌঁছবই।

মুক্ত আলোচনা, ৬ মার্চ ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

নাসির উদ্দিন ইউসুফ।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত
স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার।

event.quantummethod.org.bd

একাত্তরের সমমর্মিতা ফিরিয়ে আনতে হবে

নাসির উদ্দিন ইউসুফ

২৮ মার্চ ১৯৭১। আমরা কেরানীগঞ্জে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। ২ এপ্রিল ভোরে ঘুম ভাঙল গুলির আওয়াজে। হানাদার বাহিনী আমাদের ক্যাম্পটির কথা জেনে গেছে। মাদ্রাসার মাঠে পজিশন নিয়েছে ওরা। খালের ওপারে শালবনের ফাঁক দিয়ে দেখলাম চারদিক থেকে গুলি করছে ওরা। মানুষ প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। এলএমজি ফায়ার করার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ল। যারা তখনো মারা যায় নি, তাদের গায়ে পাকিস্তানিরা আগুন লাগিয়ে দিল। সেদিন এমনও দেখেছি, একজন মানুষ দৌড়াচ্ছে। তার কানে গুলি লেগে মাথাটা ছুটে গেল। লোকটা দু-তিন পা এগিয়ে ঢলে পড়ল। এমনই ছিল একাত্তরের গণহত্যা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি রাজনৈতিকভাবে প্রথম সচেতন হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। 'জয় বাংলা' ধ্বনিটি এসেছিল স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, ১৯০৬ সালে। তারপরের ইতিহাস করুণ, রক্তাক্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ।

স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হলো। বিশ্ব-ইতিহাসে এরকম ট্র্যাজিক ঘটনা দ্বিতীয়টি নেই। রাতের অন্ধকারে বসে বাঙালি জাতিকে ভাগ করা হলো ধর্মের ভিত্তিতে। ১৯৭১ সালে আগরতলা যাওয়ার সময় দেখেছি, একই বাড়ির শোয়ার ঘর পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে আর রান্নাঘরটা ভারতে। মায়ের ঘর পূর্ব বাংলায়, ছেলের ঘর ত্রিপুরায়। এর চেয়েও বড় ট্র্যাজেডি হলো দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির ভাষা ছিল উর্দু। ১৯৪৭-এর আগে শাসকদের ভাষা ছিল ইংরেজি। তারও আগে ফারসি। সংগত কারণেই ১১ মার্চ ১৯৪৮ জিন্নাহ ঢাকায় এসে বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি বলল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হলো, যা বাঙালি জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও বড়। কারণ ভাষাটা যদি সেদিন না বাঁচত, আজকের বাংলাদেশ হতো না।

বাংলা ভাষার প্রতি সেদিনের যে আগ্রাসন, তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রমাণ করল বাঙালি স্বতন্ত্র জাতি। তার ইতিহাস হাজার বছরের। এই ভূখণ্ড আমাদের। আমরা নিজস্ব রাষ্ট্র চাই। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমশ রূপ নিল জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে। সত্তরের নির্বাচনের পর 'জয় বাংলা' ধ্বনিটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বাঙালির হাতে ক্ষমতা দেয়া হলো না। ঘনিয়ে এলো ২৫শে মার্চ।

সে-রাতে ঢাকার শান্তিনগরের একটি বাড়ির ছাদ থেকে দেখলাম পাক আর্মির তাণ্ডব। মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহর যেন জ্বলছে। গান পাউডার ও কামানের গোলায় চলল ব্যাপক ধ্বংসলীলা। আসলে ২৫ মার্চের আগে আমরা ভেবেছিলাম স্লোগান দিয়ে মিছিল করে কিছু একটা করে ফেলব। কিন্তু পাকিস্তানের মতো নিপীড়ক রাষ্ট্রের হিংস্র সেনাবাহিনীর কাছে দয়া-মায়া প্রত্যাশা করা ভুল।

২৬ মার্চ ভোরে দেখেছি, লাশ টেনে টেনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। রাজারবাগে কাঁটাতারের ওপর নিহত পুলিশ ভাইদের লাশ ঝুলছিল। শরীর থেকে হাত-পা আলাদা। আগের রাতে অবশ্য কিছু পুলিশ পালিয়ে আমাদের এলাকায় আসতে পেরেছিল। তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম সাতটা রাইফেল ও গুলি। শহরে তখন কারফিউ। বিদ্যুৎ-পানি নেই, টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন।

২৭ মার্চ চার ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। জগন্নাথ হল থেকে নীলক্ষেত–পুরো এলাকায় লাশ আর লাশ! দ্রুত ফিরে এসে অস্ত্রগুলো বের করে সোজা সদরঘাট। কোথায় যাচ্ছি জানি না। জিঞ্জিরায় পৌঁছে দেখি, লক্ষ লক্ষ মানুষ ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।

তখন মানুষ নিজে না খেয়ে অচেনা অসহায় মানুষকে খাইয়েছে। শহর,

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

গ্রাম কোথাও খাবার পেতে মুক্তিযোদ্ধাদের অসুবিধা হয় নি। সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জের দিকে দেখেছি–মাঝিরা মাছ ধরে ফেরার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে কিছুটা রেখে যেত। গ্রামের কৃষক সবজি দিয়ে যেত। সেদিন সবাই একে অন্যের দিকে মমতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা ঘটনা বলি। কেরানীগঞ্জে এক কৃষকের বেড়ার ঘরে আমরা অস্ত্র রাখতাম। একদিন ওখানে গিয়েছি গ্রেনেড নিতে। আমি গ্রেনেডের পিন খুলে বাড়ির ছোট্ট ছেলেটিকে দিচ্ছি, সে শুকাতে দিচ্ছে। ওর সাথে কথা বলতে বলতে বেখেয়ালে হঠাৎ পিন খুলে লিভারটা ছেড়ে দিয়েছি। ভুল টের পেতেই গ্রেনেডটা দু-হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরলাম। ছেলেটা লাফিয়ে বাইরে চলে গেল। আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে ঘামছি।

কিন্তু ফাটল না! গ্রেনেড খুলে দেখি, ভেতরে একটা পানির বিন্দু থাকায় প্রাণে বেঁচে গেছি। দুপুরবেলা খেতে বসে দেখি, মাটির থালায় দুধ-ভাত। আমি তো অবাক।

কৃষকের স্ত্রী বললেন, আপনি বেঁচে গেছেন বলে মসজিদে শিন্নি দিয়েছি! অথচ আমি তাদের কেউ না। ৪৫ বছরে একবার দেখা হয়েছে। আর হয়তো হবেও না। একাত্তরের সম্পর্কটা এমনই। যা কোনোকিছু দিয়েই পরিমাপ করা যাবে না।

তাই সেদিন যে আদর্শ, চেতনা ও মানুষে মানুষে মমতা-ভালবাসা ছিল তা হৃদয়ে অনুভব করতে হবে। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পৃথিবীতে এসেছে অস্ত্র ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। একাত্তরের আদর্শ ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার জন্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আমি তাই আশাবাদী। থিয়েটারের কাজে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম যমুনার চরে। পুরোটা পথ হেঁটে যেতে হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা এসেছে শুনে সেখানকার শিশুরা পতাকা হাতে হাজির। তারা মুক্তিযুদ্ধের কতটুকুই-বা বোঝে! কিন্তু এই সরলতা ও মমতা এখনো আছে বলেই বাঙালি আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তরুণ প্রজন্ম সেই কাজটি পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

মুক্ত আলোচনা, ১ ডিসেম্বর ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

আফজাল হোসেন।
খ্যতিমান অভিনেতা, নাট্যকার,
নির্মাতা, চিত্রশিল্পী ও লেখক।

event.quantummethod.org.bd

ভালো কথা ভালো কাজ সবসময়ই আশা জাগায়

আ ফ জা ল হো সে ন

আমার খুব পড়ার নেশা। আর আছে জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ। কীভাবে জীবন উন্নয়ন করতে হয়, কীভাবে সফল পেশাজীবী হতে হয়–এসব বিষয়ে আমি প্রচুর পড়েছি। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার একটা উপলব্ধি হলো, পড়ে আসলে এগুলো কিছুই জানা হয় নি; কারণ পড়া মানে আমি শুধু পাঠকই থেকে গেছি, আর এ কোর্স থেকে যখন বাড়ি ফিরেছি–মনে হয়েছে আমি সত্যিই একজন শিক্ষকের কাছ থেকে ফিরলাম।

আমি যা পড়েছি, গুরুজী এখানে তা-ই বলছেন। সবার উপযোগী করে বলছেন। এ কোর্সে যারা এসেছেন, তারা একেকজন একেক মাত্রার মানুষ। অর্থাৎ সমপরিমাণ মেধা ও অনুধাবন-ক্ষমতা এখানে সবার নেই। কিন্তু তিনি সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছেন। এটা একটা মহাযোগ্যতা। সবচেয়ে বড় কথা, কঠিন কথাগুলো তিনি বলেছেন হাস্যরসের মধ্য দিয়ে, যেন আমরা তা মনে রাখতে পারি। ধারণ করতে পারি।

আরেকটি ব্যাপার আমার ভালো লেগেছে, এ কোর্সের চার দিন যাদের সাথে কাটিয়েছি–তাদের সবাইকে 'আমার' বলে মনে হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর কিছু মানুষ এদেশে রয়েছেন তা পুনর্বার বিশ্বাস করতে হলো। এই চারটি দিন তারা সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে প্রতিটি ভালো কথা শুনেছেন। যে সময়ে আমরা বাস করছি, যে সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য আবর্জনা গিলছি। তার মধ্যে ভালো কথা শোনা মানে হলো, মনে যে হতাশাটা ছিল সেটি আর থাকছে না।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মানুষের হতাশ হওয়ার নানান কারণ থাকে। আমার মধ্যেও কষ্ট-হতাশা কিছু আছে। আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক পেশাগত জীবনে নিজেকে একজন সুখী মানুষ বলেই মনে করি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সমাজে আমরা কেউ একা বাস করি না, আমি একা সুখী মানেই সুখী নই। আমার পাশের মানুষটি কী আচরণ করছে তা দিয়ে আমরা প্রভাবিত হই। এই হতাশাটি আমাকে প্রায়ই আক্রান্ত করে।

বন্ধুরা বলে, গায়ে মাখিস কেন? কিন্তু আমি তো হাঁস না, আমি মানুষ। গায়ে মাখব না কেন? চার দিন পর এটাই মনে হচ্ছে, মানুষ হিসেবে নিজের চিন্তাভাবনা দিয়ে আমরা যেন অন্যকে আক্রান্ত না করি।

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন–আপনি অভিনয় করেন, বিজ্ঞাপন-নাটক নির্মাণ করেন, উপস্থাপনা করেন, ছবি আঁকেন, লেখেন–কোন পরিচয়টা আপনার কাছে সবচেয়ে বড়? আমি বলি–'মানুষ' পরিচয়টা আমার কাছে সবচাইতে বড়। আমার প্রতিটা কাজের মধ্য দিয়ে যদি আমার ভেতরের 'ভালোত্ব'টাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমি যে 'মানুষ' হিসেবে জন্ম নিয়েছি, সে ঋণটা শোধ হয়।

অনেকে আবার জানতে চান, কেন কাজ করেন? কাজটা আমি করি আসলে উপভোগের জন্যে। আমি যে কাজগুলো করি তার মধ্যে একটা আনন্দ আর উপভোগের ব্যাপার আছে, আমি মূলত সেটাই খুঁজে বেড়াই। কারণ জীবনটা তো একবারের। তাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও কাজের মধ্য দিয়ে আমি ভিন্ন ভিন্ন একেকটি জগতকে বুঝতে, জানতে, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি সবসময়।

আর যে-কোনো কাজে দক্ষতা কিংবা সাফল্য অর্জনের জন্যে অধ্যবসায় তো লাগেই। এখানে সবকিছু অর্জন করে নিতে হয় এবং অধ্যবসায় দিয়েই সেটা করতে হয়। আমিও তা-ই করেছি। নিজেকে ক্রমাগত বদলে নিয়েছি। বর্তমান সময়ে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়ে একজন অভিনেতা প্রচুর উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু আমার কখনো মনে হয় নি–আমি অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেব। কারণ প্রতিদিন একই কাজ, ওটাতে এক ধরনের একঘেয়েমি আছে। আমার সবসময় মনে হয়েছে–একটা জায়গা দরকার, একটা ভাবনা দরকার, সেই ভাবনার জগতে ঢোকা দরকার এবং তাতে লেগে থাকা দরকার। আমি সেটাই করতে চেয়েছি। বাঁচতে চেয়েছি নতুন নতুন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায়।

event.quantummethod.org.bd

চাওয়া আমারও আছে, কিন্তু তা আমাকে লোভী করে না। লোভ থাকলে প্রতিমুহূর্তেই মনে হতো, আমি যা করছি তা আমার উপার্জনের জন্যে যথেষ্ট নয়। ফলে অশান্তি বাড়ত, শরীর-মনে অসুখ ঢুকত। মনে হতো, প্রতিদিন কেন নাটক করছি না? করলে তো লোকে নিত্য প্রশংসা করত। এমনি নানা অভাব, অতৃপ্তি, মনোযাতনা, পীড়ন আসতে পারত।

বরাবরই জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছি বলে আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটে নি। আমি বলতে পারি, কোনোকিছুই আমাকে আমার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারে না। আমার মতো থাকতে দেয়। আমি দাবি করতে পারি, আমি ভালো আছি। আমার জীবন অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমার কাছে জীবনের প্রতিটা দিনই তাই গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়।

আমি ও আমার বন্ধু হুমায়ূন ফরিদী, আমরা দুজন একই বয়সের, একইসাথে অভিনয় করেছি। কিন্তু আজ ও নেই, আমি বেঁচে আছি! এ পৃথিবীর আলো বাতাস বন্ধুসঙ্গ সবই উপভোগ করছি। এই বেঁচে থাকাটাই তো একটা স্মরণীয় ঘটনা। আমি নিশ্চিত জানি–আমিও একদিন থাকব না, তখনো এ পৃথিবীর সবকিছু এভাবেই চলবে। ভালোভাবেই চলবে। সৃষ্টিকর্তা এখনো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে দেখেছি, কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ-জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে এখানে বার বার বলা হয়েছে। এতে এ ধরনের অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলো আরো শাণিত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো প্রাপ্তির আশা নিয়ে কোয়ান্টামে আসি নি। নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকি, কয়েকটা দিন আমার অবসর দরকার ছিল। একটু ভিন্ন মাত্রার অবসর। সে হিসেবে বলতে পারি, সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে। আমি উপভোগ করেছি। আর সেটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আবার এখানে আসব, বন্ধুদের নিয়ে আসব–কোনো প্রাপ্তির আশায় নয়, আসব শুধু এই ভালো কথাগুলো শোনার জন্যে। আশা তো জাগায় ভালো কথা, ভালো কাজ। আমাদের দেশটায় ভালো কথার খুব অভাব রয়েছে। কোর্সে যতক্ষণ ছিলাম, মনে হয়েছে, এ কথাগুলো যদি দেশের সব অঞ্চলের সব মানুষকে শোনানো যেত, সচেতন করা যেত, খুব ভালো হতো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মার্চ ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

আহসান হাবীব।
জনপ্রিয় রম্য সাহিত্যিক ও কার্টুনিস্ট।
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, মাসিক উন্মাদ।

event.quantummethod.org.bd

দেশকে সুন্দর করার জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন

আহসান হাবীব

সারা পৃথিবীতে ধ্যান বা মেডিটেশন নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। আমাদের পাশের দেশ ভারতেও হচ্ছে। ওখানে সব বিখ্যাত যোগীরা আছেন। তাদের সর্ম্পকেও আমি বিভিন্ন সময় পড়েছি।

প্রায় সাত হাজার বছর আগে এমনই একজন ঋষি ছিলেন, যার নাম ঋষি পতঞ্জলী। আমরা রাতের আকাশে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখি, তার একটি নক্ষত্রের নাম কিন্তু এই ঋষির নামে।

ধ্যানের প্রসঙ্গে তার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একবার সমুদ্রপাড়ে একমুঠো বালু হাতে নিয়ে তিনি কাঁদছিলেন। তখন তার বন্ধুস্থানীয় যারা ছিলেন তারা প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার ঋষি তুমি এভাবে কাঁদছ কেন? পতঞ্জলী বললেন, দেখ আমার হাতে একমুঠো বালু কিন্তু এগুলো সম্পর্কে আমি কিছু জানতে পারছি না। এই বালুকণাগুলো কীভাবে এলো? কোথা থেকে এলো? তাহলে পৃথিবীর চারদিকে এত যে রহস্য, এগুলো আমি কবে জানব! এই জন্যে আমি কাঁদছি।

তারপর তিনি জ্ঞানের সন্ধানে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যিই ঋষি পতঞ্জলী ধ্যানের মাধ্যমে বহু কিছু জেনেছিলেন। তার সময়ে এত বইপত্রও ছিল না। ধ্যানের মধ্য দিয়েই তিনি অজানাকে জেনেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, যোগানন্দ–সকলেই যোগী ছিলেন, ধ্যানী ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন। আসলে ধ্যানের যে ক্ষমতা, তা অসাধারণ। মানুষের অবচেতন মনের শক্তিকে অনুভব করার মাধ্যমও এই ধ্যান।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মেডিটেশন বা কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল ছিল। কৌতূহল থেকেই আমি ভাবলাম, আমাদের দেশে তো মেডিটেশন নিয়ে একজনই কাজ করছেন, তিনি হলেন আমাদের গুরুজী। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে কী শেখানো হয় তা জানতেই অংশ নিলাম ৪৫০ তম ব্যাচে।

আমি অবশ্য একা আসি নি। আমার বড় দুই বোন এবং আমার স্ত্রীও এ কোর্সে অংশ নিয়েছেন। আমরা চার জন একসঙ্গে এই কোর্সটা করলাম। আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি।

আমার মনে হয়, কোর্সটা এমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে করাই ভালো। পরিবারের চার-পাঁচ জন একসঙ্গে এলে নিজেরাই আলোচনা করে বিষয়গুলো ঠিকঠাক করে নেয়া যায়, আবার নিয়মিত চর্চা করাও সহজ হয়। তাই আমরা যে চার জন একসঙ্গে শিখলাম, তারা নিজেরা আলোচনা করে বিষয়টা বুঝতেও সুবিধা হবে।

কাজেই আশা করব, যারা মেডিটেশন করবেন তারা পরিবারের সদস্যরা মিলে একসঙ্গে করবেন। আমার ধারণা, একা করার চেয়ে সম্মিলিতভাবে করলে মেডিটেশন চর্চা আরো ফলপ্রসূ হবে।

আমি গুরুজীর প্রত্যেকটা আলোচনা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। তিনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন। তিনি নানারকম গল্প দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছি।

কোর্সে আরেকটি বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে। এখানে প্রতিটি আলোচনা করা হয়েছে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে। কনফুসিয়াসের সময় চীনা দার্শনিক যারা ছিলেন, তারা কেউ হাসতেন না। দাঁত দেখা গেলেই মনে করা হতো সে আসলে মূর্খ, সে জ্ঞানী না—এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। এখন কিন্তু দিন বদলেছে। এখন ঐ ব্যাপারটা নেই যে, জ্ঞানী হলেই গম্ভীর থাকতে হবে। আমাদের গুরুজী খুব হাস্যরসপ্রিয় একজন মানুষ। তার সেন্স অব হিউমার অসাধারণ।

আমি নিজে লেখালেখি করি এবং আমার লেখালেখির বিষয়ও রম্য। আমার পত্রিকার বয়স ৪০ বছর। ৪০ বছর ধরে আমি কার্টুন আঁকছি। আমাকে এসব বিষয় নিয়েই কাজ করতে হয়।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সেন্স অব হিউমার আমি পছন্দ করি। কোর্সে আমি দেখলাম, গুরুজী যতগুলি মেডিটেশন করালেন, প্রত্যেকটার আগে একটা করে গল্প বললেন। গল্পগুলো খুবই মজার। যখনই আমরা কোনো

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

গভীর বা কঠিন বিষয়ে বলি, মানুষ কিন্তু চট করে গ্রহণ করে না। সেটা যদি হিউমারের ভেতর দিয়ে কিংবা একটা সুন্দর গল্পের ভেতর দিয়ে বলা হয়, আমাদের মনে থাকে। গুরুজী এ-কাজটিই করেন। যে কারণে আমি প্রতিটি মেডিটেশন খুব উপভোগ করেছি।

আমি চাই বাংলাদেশের সবাই এখানে আসুন। কারণ মেডিটেশন সবার করা উচিত। তাহলে নিজের তো উপকার হবেই, দেশেরও উপকার হবে। আমাদের দেশটাকে সুন্দর করার জন্যে মেডিটেশনের দরকার আছে।

এ-ছাড়া কোয়ান্টাম পরিবারের যত লোকই আমি দেখি, সবার সাথে সবার একটা সুন্দর বন্ধন আছে। এক ধরনের আত্মিক যোগাযোগ আছে সবার মধ্যে। আমি মনে করি, এই যোগাযোগটা যদি সারাদেশে সব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে আরো ভালো হবে। এভাবেই আমরা সামনের দিনগুলোতে সুন্দর একটা পৃথিবীর প্রত্যাশা করতে পারি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স প্রত্যয়ন, ৪৫০ তম ব্যাচ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

উষ্ণ হৃদয় ও ঠান্ডা মস্তিষ্কের
সম্মিলনেই সাধারণ মানুষ অনন্য মানুষে
রূপান্তরিত হয় ।

আমরা খ্যাতিমান হতে চাই।
কিন্তু খ্যাতির জন্যে নীরব সাধনা ও
প্রয়োজনীয় কষ্ট স্বীকার করি না।
ফলে সাধনাও হয় না, খ্যাতির শীর্ষেও
পৌঁছতে পারি না।

event.quantummethod.org.bd

চিকিৎসাবিজ্ঞান

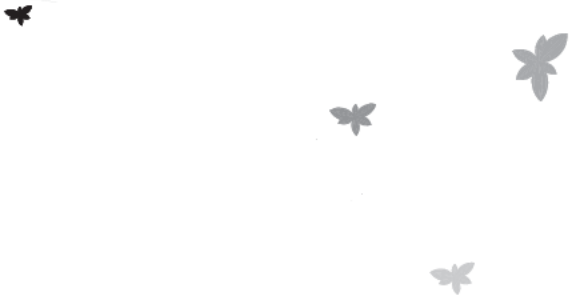

speech.quantummethod.org.bd

শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান।
প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী। বাংলাদেশে
শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে
তার ভূমিকা কিংবদন্তিতুল্য।

event.quantummethod.org.bd

শিশুকে স্বনির্ভর ও পরিশ্রমী করে গড়ে তুলুন

এ ম আ র খা ন

শিশুদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। তারা আনন্দ পেলে হাসে, ব্যথায় কাঁদে। তাদের মন সরল ও অকৃত্রিম। তারা অনেক সময় তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা বোঝাতে পারে না। তাই তাদের জন্যে সবসময় ভালো কিছু করার চেষ্টা করি। নিয়ত থাকে শিশুদের সেবা করার এবং বিশ্বাস করি আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমার হাতযশের রহস্য আসলে এটাই।

শিশুদের নিয়ে বর্তমান যুগের মা-বাবাদের অনেক সমস্যা। প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন এবং সবাই চান তার সন্তান সর্বক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান হবে। কিন্তু ফার্স্ট তো সবসময় একজনই হয়। সুতরাং যে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে সবাইকেই তার মতো হতে হবে– এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই বাবা-মায়েরা শিশুদের জীবনে টেনশন সৃষ্টি করেন এবং নিজেরাও অশান্তিতে ভোগেন।

একটি শিশু যে শুধু লেখাপড়ায় ভালো হবে তা নয়। তার আর্টে দক্ষতা থাকতে পারে। কবিতা কিংবা খেলাধুলায় দক্ষতা থাকতে পারে। সবাইকেই ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কেন? আল্লাহ তায়ালা একেকজনকে একেকভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে, এটা তো ঠিক নয়। উচিতও নয়। তাহলে আমরা নজরুলও পেতাম না, রবীন্দ্রনাথও পেতাম না, জসীম উদ্‌দীনও পেতাম না। কিন্তু এদেরকেও প্রয়োজন আছে আমাদের সবার।

শিশুরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি শিশুর ভালো ও

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা গেলে পরবর্তীতে একজন সফল মানুষ, ভালো মানুষের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এজন্যে কৌটার দুধ ও ফাস্টফুড সংস্কৃতি পরিহার করে শিশুকে প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব প্রত্যেক মা-বাবার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শারীরিক শ্রম। সন্তানকে সারাক্ষণ ননীর পুতুলের মতো আগলে না রেখে তাকে স্বনির্ভর এবং তার সাধ্যমতো শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক মানসিক সুস্থতার জন্যেই এটা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সাইকোসোমাটিক রোগগুলো যে এত বেশি দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হলো স্ট্রেস ডিজ-অর্ডার বা মানসিক চাপ সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। এটা আগে ছিল না। তখন আমাদের মন সৎ ও কল্যাণচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আমাদের শৈশবে মানুষের এত চাহিদা ছিল না। চাহিদার পেছনে আমরা এত দৌড়াতামও না। অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতাম। তাই ভালো থাকতাম।

কেউ এ বয়সে আমার সুস্থতার রহস্য জানতে চাইলে আমি বলি, রহস্য একটাই–নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন এবং সৎচিন্তা, ভালো চিন্তা। সবার ভালো চিন্তা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আমার শত্রুও ভালো থাকুক। সৎচিন্তা থাকলে জীবনে কোনো টেনশন থাকে না এবং ভালো থাকা যায়। আমি এটাই সবসময় মেনে চলার চেষ্টা করি।

আমি সবসময় রাগ-ক্ষোভ থেকে দূরে থাকি। কখনো যদি রাগ আসতে চায় আমি চুপ হয়ে যাই। কারণ রেগে গেলে শরীরে এড্রিনালিন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়, যার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তাই রাগ বর্জন করা গেলে স্ট্রেসের কারণে সৃষ্ট রোগগুলো থেকে মুক্ত থাকা যাবে। যিনি রাগ বর্জন করতে পেরেছেন তিনি সার্থক মানুষ এবং সত্যিকারের সাধক। কারণ রাজ্য জয় করা কঠিন, কিন্তু রাগ জয় করা আরো কঠিন।

মানুষের অসুস্থতার যে অনুভূতি, তার উৎস মূলত ব্রেন। ব্রেনের বিভিন্ন ওয়েভ এ অনুভূতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন কোনো অসুখ হয় তখন ব্রেনে এর প্রতিফলন ঘটে, যার প্রভাব শরীরে দেখা দেয়। তাই ব্রেনটাকে যদি সুস্থ রাখা যায় তাহলে সবই সুস্থ থাকে। আর ব্রেনকে সুস্থ রাখতে হলে মেডিটেশন প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞানও তাই এখন বলছে যে, মেডিটেশন আমাদের ব্রেনকে চমৎকারভাবে প্রভাবিত করে।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

ব্রেনকে যদি আমরা পরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়। মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব। মেডিটেশনের মাধ্যমে একজন মানুষ যদি তার ব্রেন ওয়েভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে তিনি মনোদৈহিক সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত একটি সত্য।

উচ্চ রক্তচাপ, এজমা, এলার্জি, একজিমা ইত্যাদি রোগগুলো মূলত সাইকোসোমাটিক। সারাজীবন ওষুধ খেয়েও এ রোগগুলো পুরোপুরি ভালো হয় না। কিন্তু মেডিটেশনের মাধ্যমে ব্রেনকে প্রভাবিত করে এ থেকে পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। মেডিটেশন ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন–এটা সব মানুষেরই কাম্য। কথাটা সত্যিই খুব চমৎকার। শুনতেও খুব ভালো লাগে। এটা অর্জনের জন্যে আমাদের সচেতনভাবে চেষ্টা করা উচিত। সুস্থ, দুশ্চিন্তামুক্ত এবং কর্মোদ্দীপ্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে আমাদের সবাইকে। তাহলেই আমরা সুস্থ থাকব। আর সেইসাথে বিশুদ্ধ নিয়তে কোনো কাজ শুরু করলে আল্লাহও সাহায্য করেন।

মাটির ব্যাংক ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কোয়ান্টাম অসংখ্য মানুষকে সৎদানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমাদের সবারই সামর্থ্য রয়েছে। কেউ পাঁচ টাকা দিতে পারে, কেউ পাঁচ পয়সা দিতে পারে। এই পাঁচ পয়সাই সবার সম্মিলিত দানে একসময় কয়েক কোটি টাকায় পরিণত হয়। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোনো বড় কাজ করা যায় না। আমরা কেন ভিক্ষা করব? আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন তা আমরা কাজে লাগাই না কেন? কোয়ান্টাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে স্ব-অর্থায়নে সব কাজ করছে–এটা আমার খুব ভালো লাগে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে অসংখ্য মানুষ সুস্থতা ও নিরাময় লাভ করছেন। উপকৃত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আরো হাজারো মানুষ সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে এগিয়ে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কোয়ান্টামের এ যাত্রা শুভ হোক সার্থক হোক–করুণাময়ের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সেপ্টেম্বর ২০১০

speech.quantummethod.org.bd

জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক।
বাংলাদেশে আধুনিক হৃদরোগ চিকিৎসার
পথিকৃৎ। হৃদরোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতেও
তিনি এদেশে একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব।
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা
তার জীবনের অনন্য কীর্তি।

event.quantummethod.org.bd

মনের শুদ্ধি নিশ্চিত করে সুস্থ জীবন

আ ব্দু ল মা লি ক

বোখারী শরীফের হাদীস হচ্ছে, 'মানুষের শরীরে এক টুকরো মাংসপিণ্ড আছে, যা ভালো থাকলে সমস্ত শরীর ভালো থাকে আর তা দূষিত হয়ে পড়লে সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যায়। সেটা হলো ক্বালব।' এর একটি অংশ হলো এনাটমিক্যাল হার্ট বা হৃৎপিণ্ড, অপরটি হলো হৃদয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড আর হৃদয় এক কিনা, তা নিয়ে আছে বিচিত্র অভিমত।

মানুষের জন্মরহস্য বেশ সূক্ষ্ম ও জটিল। শরীরের প্রতিটি কোষের মধ্যেই রয়েছে চেতনা এবং এতে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়া চলছে। মায়ের গর্ভে আমাদের যখন জন্ম হয় তখন তা প্রথমে একটিমাত্র কোষ থাকে। সেই কোষটি ভাগ হতে হতে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি–এভাবে নয় মাসে পুরো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠে।

মানবশিশুর হৃৎপিণ্ড তৈরি হয় গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে। একে বলা হয় মাস্টার অর্গান, কারণ হৃৎপিণ্ডই পুরো শরীরে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অঙ্গ নিরলসভাবে কাজ করতে থাকে। কোনো কারণে যদি হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের মৃত্যু ঘটে। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গই আমাদের জন্যে জরুরি। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃক্ক, যকৃৎ প্রত্যেকেই সুশৃঙ্খল ও সমন্বিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে সম্ভব হচ্ছে আমাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা। আর এই সমন্বয়ের কাজটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সচেতন চেষ্টা ছাড়াই।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আল্লাহ মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করলেন, তারপর তাকে সবকিছু শিখিয়ে দিলেন। সেই মানুষ আজ তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে কত কী করছে! বিজ্ঞানীরা একে একে মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন করছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতেও ঘটে চলেছে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। এখন হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, যার শরীরে হার্ট প্রতিস্থাপন করা হলো তার মানসিকতা ও খাদ্যাভ্যাসে নানা পরিবর্তন আসে। এখানে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

আট বছরের এক শিশুর হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার পর সে চিৎকার করে কিছু ঘটনা বলতে লাগল। সে পাগল হয়ে গেছে ভেবে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, শিশুটি যে-সব ঘটনা বর্ণনা করছে তার অনেক কথাই সত্য। অনুসন্ধানে দেখা গেল, যার হার্ট তার শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ ঘটনার স্মৃতি ডোনারের হার্টের কোষে এমনভাবে রয়ে গেছে যে, এই শিশুটি খুন হওয়ার জায়গা এমনকি হত্যাকারীর নাম পর্যন্ত বলতে সক্ষম হলো। এর সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল মূল হত্যাকারী!

তাই এখন ধারণা করা হচ্ছে, আমাদের হার্টেও রয়েছে একটি মিনিমাল ব্রেন, মাইনর বা লিটল ব্রেন, যার কারণে একজন ব্যক্তির হার্ট অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন করায় তার অনেক পরিবর্তন হয় এবং অনেক কিছুই সে মনে করতে পারে। অর্থাৎ মানবদেহে হার্ট শুধু পাম্প করে না, বরং হার্টের সাথে মূল ব্রেন এবং হৃদয়েরও রয়েছে সংযোগ। অত্যন্ত মূল্যবান এ হার্টকে ভালো রাখতে হলে তাই আমাদেরকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছু তৈরি করে একটা নিয়মের মধ্যে রেখেছেন। এই নিয়মের মধ্যে মানুষ যদি ভালো কিছু করতে চায়, তার কাজ সহজ হবে। যেমন, কেউ যদি মনোযোগ ও সততার সাথে কাজ করে, সে সাফল্য পাবে। কাজ করবে না অথচ সাফল্য পেয়ে যাবে, তা হবে না।

তেমনি সুস্থ থাকতে হলেও প্রত্যেকেরই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। আগের দিনে কলেরা বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি দেখা যেত। আজকাল মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে হৃদরোগ ক্যান্সার ডায়াবেটিস ইত্যাদি অসংক্রামক ব্যাধিতে। আর একবার এ রোগগুলো কারো হয়ে গেলে তা একটি সচ্ছল পরিবারকেও অসচ্ছল করে ফেলে। সারাবিশ্বে এখন বলা হচ্ছে, ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে

event.quantummethod.org.bd

এ রোগগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এই রোগগুলো অনেকটাই মানুষের নিজের সৃষ্টি। কোরআনে (সূরা রুম, আয়াত ৪১) যেমন বলা আছে, *হে মানুষ! তোমাদের কর্মের প্রতিক্রিয়াতেই জলেস্থলে বিপর্যয় ও বালা-মুসিবত ছড়িয়ে পড়ে ...।* তেমনি এ রোগগুলোও আমাদের ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে এত বাড়ছে।

আমরা এখন ফাস্টফুডসহ নানা কুখাদ্য খাচ্ছি। ব্যায়াম করছি না। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখতে হলে সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করতে হবে। শাকসবজি ও দেশীয় ফলমূল খেতে হবে। মাংস ও চর্বিজাতীয় খাবার যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। লবণ বেশি খেলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আর ধূমপান, জর্দা, সাদা পাতা খাওয়া থেকে বিরত থাকলে অনেক রোগ থেকে বেঁচে যাবেন। সেইসাথে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা ও হাঁটার অভ্যাস করুন। অফিসে যাওয়ার সময় বা বাসায় ফেরার সময় হাঁটুন। সম্ভব হলে লিফট ব্যবহার না করে হেঁটে ওপরে উঠুন।

আসলে রোগ প্রতিরোধের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। যদি পেটে ব্যথা হয় একজন মানুষ ডাক্তারের কাছে যাবে, পয়সা দেবে, ওষুধও খাবে। কিন্তু পেটে ব্যথা না হওয়ার পরামর্শ যদি দেয়া হয়, সেটা সাধারণত মানুষ শুনতে চায় না। এ মানসিকতার কারণেই তরুণ প্রজন্মের মাঝেও এখন হৃদরোগের প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

মানুষের মন খুব চঞ্চল, সারাদিন বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে থাকে। বিশেষ করে অতীতের চিন্তা বেশি করে। কিন্তু বর্তমানই হলো আসল। এখন যদি কাজ করেন, তাহলে ফল পাবেন। মানুষের মঙ্গলের জন্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে বরকত আসবে। দক্ষতা সৃষ্টি হবে। যিনি যে পেশায় থাকুন, তিনি যদি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে সততার সাথে কাজ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সফল হবেন।

আরেকটা কথা হলো, সাফল্য এলে গর্ব করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেছেন তাঁর ওপর নির্ভর করতে। কাজেই সবসময় নির্ভর করবেন আল্লাহর ওপরে। আসল শক্তি ওখানে। যত শক্তি মমতা বুদ্ধিমত্তা–সব আসে ওখান থেকেই। আর শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হবে না, অন্যের মঙ্গলের জন্যে যার যার অবস্থান থেকে সর্বতোভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ আলোচনা, ২ নভেম্বর ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন।
দেশের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের
গাইনি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

event.quantummethod.org.bd

স্বনির্ভরতার অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম

শা হ লা খা তু ন

বাংলাদেশ সোনার দেশ, আপনারা এই সোনার দেশের সোনার সন্তান– এটা বলে আপনাদের প্রতি আমার অনুভূতি প্রকাশ করলাম। রক্তদাতাদের প্রতি এভাবেই আমি আমার সম্মান জানালাম।

আমি যখন লেখাপড়া শুরু করেছিলাম তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজই ছিল দেশের একমাত্র মেডিকেল কলেজ। তখনকার সময় ব্লাড ডোনেট করা কতটা বাধা-বিপত্তির ছিল, তা বলে শেষ করা যাবে না। এ সময়ের তরুণরা তা চিন্তাও করতে পারবে না।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি, তখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি। একটি হার্টের অপারেশন হবে। আমাদের প্রফেসর হঠাৎ ঠিক করলেন আমাদের ব্যাচের সবাইকে সেখানে থাকতে হবে। আমরা ১৮ জন ছাত্র ছিলাম। স্যারের কথামতো আমরা অপারেশন থিয়েটারে গেলাম। সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে অপারেশন দেখছি। একপর্যায়ে রোগীর প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হলো। আমাদের কাছে তখন মাত্র এক বোতল রক্ত ছিল। এ-ক্ষেত্রে বলে রাখি, এখন যেমন রক্ত সংরক্ষণ করার জন্যে এক ধরনের বিশেষ ব্যাগ ব্যবহার করা হয়, তখন এত সুবিধা ছিল না। তখন বোতলে রক্ত রাখা হতো।

কিন্তু রোগীর তো এক বোতল রক্তে কিছু হচ্ছে না। এমন অবস্থায় প্রফেসর আমাদের ১৮ জনকেই বললেন, তোমরা শীঘ্রই যাও, যার রক্তের গ্রুপের সাথে ম্যাচ হয় সে রক্ত দাও। তখন ঢাকা মেডিকেলের নীচতলায় ছোট্ট একটি রুমে ব্লাড ব্যাংক ছিল। কিন্তু তেমন কোনো কার্যক্রম ছিল না।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

এর আগে আমরা কেউই কখনো রক্তদান করি নি। কীভাবে করতে হয় তা-ও জানতাম না। সেদিন আমরা প্রথম রক্ত দিলাম। দুর্ভাগ্যবশত ঐ রোগীকে আর বাঁচানো যায় নি। এটি ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে প্রথম জানলাম, রক্ত দেয়া যায় এবং রক্ত দিলে কোনো ক্ষতি হয় না।

এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সবাই জানেন, রক্তদানে কোনো ক্ষতি হয় না। এর জন্যে আলাদা কোনো প্রস্তুতিরও দরকার হয় না। আল্লাহ মানুষের রক্ত এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছেন যেন বার বার তা দেয়া যায়। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা আবার তৈরি হয়ে যায়।

আজ শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানটির ১৩৬ তম পর্ব। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম–যিনি আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনিও একবার প্রধান অতিথি হয়ে এখানে এসেছিলেন। তার স্থানে নিজেকে দেখতে পেরে ভালো লাগছে। এখানে আসার আগে কোয়ান্টামের কার্যক্রমের কিছু প্রকাশনা পেয়েছিলাম। এগুলো পড়ে কোয়ান্টাম সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারলেও এখানে এসে বিস্তারিত জানতে পারলাম। অসাধারণ কাজ করছে কোয়ান্টাম। নিয়মিত রক্তদানে মানুষকে নানাভাবে আগ্রহী করে তুলছে।

মেডিকেল কলেজে যখন পড়ছিলাম তখন থেকে দেখেছি–রক্তের অভাবে অনেক রোগী মারা যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করতে পারি নি। কারণ তখন রক্ত পাওয়া এতটা সহজ ছিল না।

এ-ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা আরো করুণ। ছোটবেলায় জানতাম, মহিলাদের বলা হতো কুড়িতে বুড়ি আর চল্লিশে মৃত্যু। এরপরে থাকা মানে তুমি অপ্রয়োজনে বেঁচে আছো। কিন্তু এখন আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে। এখন দেখি ৫০/৬০/৭০ বছরের রোগীরাও আসেন। তাদের চিকিৎসা করি। অনেকের অপারেশনও করতে হয়। রোগীর জন্যে রক্ত পাই বলেই আমরা অপারেশন করতে পারি, আগে যা হতো না। বিশেষ করে প্রসূতিদের বাচ্চা হওয়ার সময় প্রচুর রক্ত লাগে। রক্ত পাওয়া যাবে কিনা–তা নিয়ে এখন আর চিন্তা করি না।

কয়েক বছর আগে চিকিৎসার জন্যে আসা একজন রোগীর কথা বলি। নোয়াখালী থেকে এসেছে। আমাকে বলা হলো ইমার্জেন্সি। আমি দৌড়ে গেলাম। তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত রোগীটিকে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

অবশ্য বাঁচানো গিয়েছিল। নোয়াখালী থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত রোগীটি জীবিত আসতে পারার কারণ হলো, পথে তাকে আট ব্যাগ রক্ত দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

এটা কেন সম্ভব হয়েছে? কারণ আপনাদের মতো রক্তদাতারা, যারা নিয়মিত রক্ত দিতে শিখেছেন এবং অন্যদের শেখাচ্ছেন। এ-ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বড় ভূমিকা পালন করছে।

বাইরের সাহায্য ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আমরা যে-কোনো কাজ করতে পারি, যদি আমরা তা মন থেকে চাই। যেমনটা কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তারা বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই কাজটি করে যাচ্ছে। আমি বলব, এ-ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম।

এ অনুষ্ঠানে আসার আগে কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমি জানতাম, এখানে শুধু যোগব্যায়াম চর্চা হয়। কিন্তু রক্তদান, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে খুব ভালো লাগল। সমাজের কল্যাণে যারা এসব উন্নয়নমূলক কাজ করছেন এবং যারা সাহায্য করছেন, সবার মঙ্গল হোক।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান
১৭ জুলাই ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার।
দেশের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের
গাইনি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।
প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ রোধে তার উদ্ভাবিত
সহজলভ্য চিকিৎসাপদ্ধতি *সায়েবা'স মেথড*
দেশে-বিদেশে হাজারো মায়ের জীবন বাঁচাতে
রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফিস্টুলা-আক্রান্ত দুস্থ
মায়েদের সুচিকিৎসার জন্যে সরকারি চাকরি
থেকে অবসর গ্রহণের পর পেনশনের পুরো অর্থ
ব্যয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মাম'স
ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ।

event.quantummethod.org.bd

আমরা সচেতন হলেই সমাজে পরিবর্তন আসবে

সায়েবা আক্তার

২০০০ সাল। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সে-সময় গাইনি ওয়ার্ডে প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একটি মেয়ে মারা গেল। ডাক্তার নার্স সবাই মিলে আমরা খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেল না। বাঁচানো গেল না মেয়েটিকে।

সেই রাতে আমি আর ঘুমাতে পারলাম না। বার বার শুধু মনে হচ্ছিল– মাত্র ১৮ বছর বয়স মেয়েটির, মা হতে গিয়ে সে এভাবে মারা গেল। আমরা কিছুই করতে পারলাম না!

সন্তান জন্মদানকালে পৃথিবীতে যত মা মারা যায়, তাদের প্রতি তিন জনের একজনের মৃত্যুর প্রধান কারণ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। আমাদের দেশেও শতকরা ৩১ ভাগ মাতৃমৃত্যুর কারণ এটি। এসময় মায়ের রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হলেই তাকে বাঁচানো যায়।

এ-বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এক ধরনের বেলুন দিয়ে রক্তপাত বন্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল আমাদের। ইংল্যান্ড থেকে আনা সেই বেলুনটির দাম ৩০০ ডলার, কিন্তু মাত্র একবারই এটি ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মতো একটি দেশের জন্যে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

সেই মেয়েটি যেদিন মারা গেল, আমার শুধু মনে হচ্ছিল, বেলুনটি থাকলে হয়তো আজ মেয়েটি প্রাণে বেঁচে যেত। এরকম নানান চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন, হঠাৎ মনে হলো, কনডম তো একটা মেডিকেল টুল। আর এটি

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সুলভ ও সাশ্রয়ী। বেলুনের জায়গায় কি এটা ব্যবহার করা যেতে পারে না? তাতে যদি কিছু কাজ হয়!

এ ঘটনার একদিন পরেই আমি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছিলাম। জানতে পারলাম, সিজারিয়ান অপারেশনে একজন মা মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কিছুতেই তার রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে জরায়ু অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ রোগীর ক্ষেত্রেও সেই প্রস্তুতিই চলছিল। আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে বললাম, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখি তো! রোগীর জরায়ুতে একটি কনডম প্রবেশ করিয়ে তাতে স্যালাইন ভরে ওটা ফোলানো হলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তপাত বন্ধ হলো। রোগীটা বেঁচে গেল!

সহকর্মী ডাক্তারদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করলাম পরের বছরের জানুয়ারি থেকে। একে একে ২৩ জন মৃত্যুপথযাত্রী প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলাম এবং সফল হলাম। ২০০৩ সালে আমাদের গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রথম প্রকাশিত হলো। ২০০৫ সালে এ-বিষয়ক গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব গাইনোকোলজি এন্ড অবস্টেট্রিকস*-এর জার্নালে।

এভাবেই উদ্ভাবিত হলো *সায়েবা'স মেথড*। এরপর আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গাইনি চিকিৎসায় ও মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে যুক্ত হয়েছে সায়েবা'স মেথড। এসব দেশে হাজার হাজার দরিদ্র মায়ের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে এটা। আমাদের জন্যে যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমি মনে করি, এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এটা সম্ভব হয়েছে আল্লাহ তায়ালার করুণা এবং আমার রোগীদের আন্তরিক দোয়ার ফলে।

এদেশের মায়েরা অনেক দিক থেকে অসহায়। এই উপলব্ধিটা আমার হয়েছে মেডিকেলে কলেজে পড়তে এসে। যদিও আমি কখনো ডাক্তার হতে চাই নি। কিন্তু আমার বাবার ইচ্ছে ছিল, চিকিৎসক হয়ে আমি মানুষের জন্যে কিছু করব। মূলত তার অনুপ্রেরণাতেই আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম। প্রথম দুই বছর মেডিকেলের পড়ায় কোনো আগ্রহ পাই নি। চলেও

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

এসেছিলাম কয়েকবার। কিন্তু থার্ড ইয়ারে যখন রোগীদের সংস্পর্শে এলাম, তখন থেকে আর কোনো দ্বিধা কাজ করে নি। রোগীদের অসহায়ত্ব দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম, এদের জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে।

আজ জীবনের এই প্রান্তে এসে আমি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি। তারা যদি আমাকে উৎসাহ না দিতেন, তাহলে আমাদের দেশের অসহায় মায়েদের জন্যে কিছু করার সুযোগ আমার হতো না। অভিভাবকদের সিদ্ধান্তগুলো কখনো কখনো সন্তানদের ভালো লাগে না। কিন্তু তারা যে কথাগুলো বলেন তা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন।

প্রসূতি মায়েদের জন্যে কাজ করতে গিয়ে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে সারাক্ষণ বিশ্রাম নেয়াই হচ্ছে পরিচর্যা। এটি ভুল ধারণা। অতিরিক্ত পরিশ্রম যেমন গর্ভবতী মায়ের জন্যে ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর অতিরিক্ত বিশ্রামও। স্বাভাবিক চলাফেরা ও দৈনন্দিন কাজগুলো করাই স্বাস্থ্যসম্মত।

কারো কারো আবার ধারণা, সন্তানসম্ভবা মাকে অনেক বেশি পরিমাণে খেতে হবে। এটাও ঠিক নয়। মায়ের সুস্থতা ও শিশুর বিকাশে সাধারণ পুষ্টিকর খাবারই যথেষ্ট। আর মায়ের শৈশবকালীন স্বাস্থ্য তার গর্ভাবস্থাকে প্রভাবিত করে। তাই একজন কিশোরীর পুষ্টি-পরিচর্যার ব্যাপারে পরিবারকে মনোযোগী হতে হবে। কিশোরীর যত্ন নেয়ার অর্থ হলো, তাকে একজন সুস্থ মা হতে সাহায্য করা।

এর পাশাপাশি দরকার নিরাপদ প্রসব। চিকিৎসক হিসেবে বলব, মাকে বাঁচিয়ে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারার যে আনন্দ তা অতুলনীয়। পৃথিবীতে এর মতো আনন্দ আর হয় না। কিন্তু অদক্ষ ধাত্রীর হাতে অনিরাপদ প্রসবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মা ও শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র মায়েরাই এর শিকার। এতে পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের।

এমনই একটি রোগ ফিস্টুলা। যার অন্যতম কারণ বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত প্রসব। এ ধরনের রোগীদের প্রস্রাব-পায়খানার ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। এই রোগীরা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না, কেউ কাজেও রাখে না তাদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীরা তাদের ত্যাগ করে। অধিকাংশের জীবনই কাটে নিদারুণ অবহেলা আর বঞ্চনায়।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমার সবসময়ই ইচ্ছা ছিল এই দুস্থ মায়েদের জন্যে কিছু করার। এ লক্ষ্যেই গড়ে তুলি *মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ*। এখানে ফিস্টুলা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। থাকা-খাওয়া-অপারেশনসহ সবরকম সেবাই তারা এখানে পেয়ে থাকেন।

ফিস্টুলার একমাত্র চিকিৎসাই হলো অপারেশন। আর গাইনিতে যত ধরনের অপারেশন আছে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে কঠিন। এ রোগটা যেহেতু গরিব মায়েদেরই বেশি হয়, তাই এ-ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই ডাক্তারদের নিজেদের টাকা খরচ করেই অপারেশন করতে হয়। ফিস্টুলা রোগীদের ও নিঃস্বার্থ এই ডাক্তারদের জন্যে আমি কোয়ান্টাম পরিবারের সবার কাছে বিশেষভাবে দোয়া চাই। সবাই দোয়া করবেন, মৃত্যুর আগে যেন দেখে যেতে পারি—এদেশে ফিস্টুলা আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় কোনো মহিলা কষ্ট পাচ্ছেন না, নিগৃহীত হচ্ছেন না।

আর আমাদের সকল রোগীর পক্ষ থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এবং কোয়ান্টামের রক্তদাতাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ মাম'স ইনস্টিটিউটে রোগীদের জন্যে যে রক্তের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগই আমরা পেয়ে থাকি কোয়ান্টাম থেকে। প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ চিকিৎসায় প্রথম প্রয়োজন হলো রক্ত। তখন রক্ত না পেলে মাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

একটা সময় নিরাপদ রক্ত পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। সে-সময় পেশাদার রক্ত-বিক্রেতাদের কাছ থেকে রক্ত কিনতে হতো। এমনও হয়েছে, রোগী অপারেশন থিয়েটারে কিন্তু রক্ত কেনার সামর্থ্য রোগীর পরিবারের নেই। আমরা ডাক্তাররাই তখন নিজেদের ঘড়ি, স্বর্ণের চেইন জমা রেখে ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত এনেছি। সময়মতো রক্ত না পাওয়ায় অনেক প্রসূতি মাকে বাঁচানো যায় নি—এরকম বহু দুঃসহ স্মৃতি আমাদের কষ্ট দেয়।

স্বেচ্ছা রক্তদান, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পরিচর্যা এবং মাতৃমৃত্যু রোধে আমাদের সবার সচেতনতা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, আমরা প্রত্যেকে সচেতন হলেই সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে।

মুক্ত আলোচনা, ১ অক্টোবর ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে
করাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

চেতনা, ব্যক্তি এবং কাজ যখন
একাকার হয়ে যায় তখনই সে চেতনা
বিকশিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা
চেয়ারম্যান। তার ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও নিরবচ্ছিন্ন
কর্মপ্রচেষ্টার পথ ধরেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে
প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবার
সূচনা ঘটে বাংলাদেশে।

event.quantummethod.org.bd

মমতা ও ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য

নি জা ম উ দ্দি ন আ হ মে দ

সম্প্রতি একটি বই পড়ছি–*ম্যান'স সার্চ ফর মিনিং*। লিখেছেন গত শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা মনোবিদ ডা. ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল। অস্ট্রিয়ার এই নিউরোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে সপরিবারে বন্দি হন এবং তিন বছরের বন্দিদশা থেকে বেঁচে ফেরার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে তিনি এ বইটি লেখেন।

বইটিতে তিনি বলেছেন, জীবন হচ্ছে একটা বিয়োগান্তক আশাবাদ (Tragic optimism)। কেন ট্র্যাজিক? কারণ এই জীবনে ভোগান্তি আছে। পাপবোধ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই জীবনে মৃত্যু আছে। তারপরও আমরা সবাই কিন্তু বাঁচতে চাই। জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েডের মতে, জীবনে শক্তির উৎস হচ্ছে আনন্দ-ফূর্তি। হিটলারের মতে, এর উৎস হলো ক্ষমতা। কিন্তু ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল বলছেন, জীবনে শক্তির উৎস হচ্ছে আসলে মমতা ও ভালবাসা।

লামার এই কোয়ান্টামমের আজকের যে রূপান্তর, এর নেপথ্যে কী ছিল? মমতাই তো! ১৯৯৮ সালেও যা ছিল একটা পোড়া পাহাড়, সেই অবস্থা থেকে মমতার শক্তিতেই এটা আজ একটা কাননে পরিণত হয়েছে।

রুমির একটা কথা আছে, যার মর্মার্থ হলো–'নৈঃশব্দ্য হলো স্রষ্টার ভাষা।' এখানে এলে আমার এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই থাকতে ইচ্ছে করে। বোঝার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয়–স্রষ্টার ভাষাটা আসলে কী, তিনি কী বলছেন আমাদের। হয়তো এটা বুঝলেই আমরা কিছুটা অনুভব করতে পারব যে,

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

কী অপূর্ব মমতায় তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের সৃষ্টি করেছেন! এবার লামায় আসার পর থেকে এসব কথাই ভাবছিলাম। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক চিকিৎসক এখানে সমবেত হয়েছেন, যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে আগ্রহী। চিকিৎসাব্যবস্থার কিছু দিক নিয়ে এখন একটু বলতে চাই।

ঢাকা শহরের কথাই ধরি। ছোট-বড়, সাধারণ, কর্পোরেট কত ধরনের অগণিত ক্লিনিক-হাসপাতালই তো আছে। কিন্তু খোদ ঢাকা শহরের সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন কি তাতে মিটেছে? প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা বলতে আমরা যা বুঝি তার কতটুকু তারা পাচ্ছে?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিভাগের পক্ষ থেকে ঢাকার কড়াইল বস্তিতে আমরা একটি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করি। নিরাময়-অযোগ্য, মৃত্যুপথযাত্রী, শয্যাশায়ী, প্রবীণ আর প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে স্বল্প পরিসরে পরিচালিত একটি প্রকল্প এটি। বিএসএমএমইউ থেকে মাত্র ৩০ মিনিটের দূরত্ব। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি—নানারকম রোগে ভুগে কী ভোগান্তি, কষ্ট আর দুর্দশায় দিন কাটায় ওখানকার মানুষ!

একটু রূঢ় ভাষাতেই বলছি—স্বাস্থ্যসেবাকে প্রায় পণ্যে পরিণত করেছি আমরা। ফলে বিষয়টা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই পণ্যটা আমি কোত্থেকে কিনব। চোখ ধাঁধানো সুপারশপ থেকে নাকি পাড়ার মুদি দোকান থেকে? ঠিক এরকম একটি পর্যায়ে আছি এখন আমরা।

আমরা যখন ডাক্তার হলাম, আশির দশকের শুরুতে, আল্ট্রাসনোগ্রামের যুগ মাত্র শুরু হলো। এর পরে এলো সিটি স্ক্যান, এমআরআই আরো কত কী! এখন হরদম প্রেসক্রিপশনে লেখা হচ্ছে পেট-সিটি (PET-CT)। ৬২ হাজার টাকা যার খরচ! জানি না এর শেষ কোথায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে একটি মর্যাদাপূর্ণ সাময়িকী হলো *ল্যানসেট*। দুবছরব্যাপী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণার পর ল্যানসেট কমিশন সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। গত বছরের ২৫ জুন এই রিপোর্ট যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বদলীয় কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়, সে অনুষ্ঠানে আমারও থাকার সুযোগ হয়েছিল। রিপোর্টের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা পৃথিবীব্যাপী মানুষের ভোগান্তি কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বড় বড় হাসপাতালের মিলিত উদ্যোগে কিছু চিকিৎসা-গবেষণা পরিচালিত হয়। *সাপোর্ট স্টাডি*

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

শিরোনামে এ গবেষণা প্রতিবেদনগুলো যে চিকিৎসা-সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় তার বিজ্ঞ সম্পাদক চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন সম্পাদকীয়তে– 'গত শতাব্দীজুড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে বোধহয় আমরা কেবল একটি জিনিসই রোগীদের উপহার দিতে শিখেছি, তা হলো, হাই টেকনোলজি ডেথ!'

শব্দটা আমাকে বেশ আলোড়িত করেছিল সে-সময়। পরবর্তীকালে অসংখ্যবার আমার মনে হয়েছে, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এই হাই টেকনোলজি ডেথটাই বার বার ঘটে চলেছে এবং আমি-আপনি কেউই হয়তো এ থেকে মুক্তি পাব না। আমরা চিকিৎসকরা যেন এই জায়গাটায় নজর দিতে চেষ্টা করি। রোগীদের ভোগান্তি কমানো কিংবা হাই টেকনোলজি ডেথ এড়ানোর ব্যাপারে আমরা যেন যথার্থই সচেতন হই।

এখানে আমার বয়োকনিষ্ঠ চিকিৎসক যারা আছেন, মূলত তাদের উদ্দেশ্যে আমি এ কথাগুলো বলছি। তাদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ– আমরা যেটা পারি নি, আপনারা সেটা করুন। চিকিৎসার সাথে মমতা ও ভালবাসার মেলবন্ধন ঘটান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বছর কয়েক আগে গাইবান্ধায় একটা গবেষণা হয়েছিল। সে রিপোর্টে এসেছে চিকিৎসাব্যবস্থার কিছু নির্মম সত্য। চিকিৎসকরা রোগী প্রতি গড়ে মাত্র ১৯ সেকেন্ড সময় দেন এবং প্রতি ১৩ সেকেন্ড পর পর তারা রোগীকে থামিয়ে দেন। কথা বলতে দেন না।

চিকিৎসকরা হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবেন, 'এ-ছাড়া কী করার আছে? শোনার সময়ই তো নাই'। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সময় নেই এটা সত্য, কিন্তু সবচাইতে বড় সত্য না। আসলে আমাদের ভেতর থেকে কথা শোনার এবং বলার প্রবণতাও হারিয়ে যাচ্ছে। সময় থাকলেও আমরা এখন কথা বলি না। সময় থাকলেও আমরা মমতা-ভালবাসার প্রকাশ ঘটাই না।

আমাদের সবার ভেতরে ভালো চিকিৎসক শুধু নয়, একজন ভালো মানুষ জন্ম নিক। মমতা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটুক। ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয় আরো প্রস্ফুটিত হোক, যাতে আমরা মানুষকে আরো বেশি সেবা ও ভালবাসা দিতে পারি। জীবনের উদ্দেশ্য তো তা-ই!

মেডিকেল ক্যাম্প, কোয়ান্টামম, ৪ জানুয়ারি ২০১৯

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ডা. তাহমীনা বেগম।
বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী ও লেখক।
ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম)
শিশু বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।
বাংলাদেশ নিওন্যাটাল ফোরামের সভাপতি।

event.quantummethod.org.bd

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে

তাহমীনা বেগম

এই প্রথম লামায় গেলাম। এক যুগেরও বেশি সময় আগে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছি, কিন্তু লামায় মেডিকেল ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ হলো এবারই প্রথম।

রাতের ট্রেন আর পরদিন সকালে মাইক্রোবাসে যাত্রা ছিল কিছুটা ক্লান্তিকর। কোয়ান্টামমে পৌঁছার পর পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল নিমেষেই। মমতায় ঘেরা কোয়ান্টামমের চারদিকে বৃক্ষের সবুজ, আকাশের নীল, পাখির কলতান আর প্রকৃতির নির্মল প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল।

সেন্টারে ঢুকে কিছুদূর এগোলেই সিঁড়ি বেয়ে রাহমাতান কটেজ। সহযাত্রীদের একজন বাঁশের তৈরি একটি লাঠি ধরিয়ে দিলেন, পথের বন্ধু। সেদিন বিশ্রাম।

পরদিন (৪ জানুয়ারি) মেডিকেল ক্যাম্প। দূরদূরান্ত থেকে ছয় হাজারেরও বেশি রোগী এলেন। তাদের সেবা দিলেন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞসহ ১২৯ জন ডাক্তার। রোগী নিবন্ধন, চিকিৎসা-পরামর্শ, ওষুধ বিতরণ সবকিছুই ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক্তাররা এসেছেন। কয়েকজন মহিলা ডাক্তার এসেছেন সুদূর খুলনা থেকে। জেনে অবাক হলাম। মানুষের জন্যে, কোয়ান্টামের জন্যে তাদের ভালবাসা দেখে মন আপ্লুত হলো।

রাতে সবাই মিলে উপভোগ করলাম প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

৫ জানুয়ারি। 'শাফিয়ান'-এ (কোয়ান্টামম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র) উদ্বোধন করা হলো অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার গাইনি ওয়ার্ড। প্রশমন সেবা চালুর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করল অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম।

তার আগে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম অবারিত প্রকৃতির প্রশান্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা স্কুল, কলেজ, শিশুসদন, জিমনেসিয়াম। উপভোগ করলাম ওদের মনোমুগ্ধকর শারীরিক কসরত। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে জানতে পেরে ভালো লাগল। আরো জানলাম এখানে প্রতি বেলায় রান্না হয় প্রায় ২,৫০০ মানুষের। শিশুদের পুষ্টি জোগাতে আছে সয়াদুধ উৎপাদন ব্যবস্থা, মুরগির খামার, পুকুরের মাছ, ফল ও সবজি বাগান।

লামায় সবকিছুই সুশৃঙ্খল, সুন্দর। কোয়ান্টামমের হাজারো নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সুন্দরভাবে, নীরবে, নিভৃতে। সদাহাস্যময় অভিব্যক্তি আর নম্র ব্যবহার ওদের করেছে ব্যতিক্রমী। বার বার মনে বাজছিল কবিগুরুর সেই গান– *জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে ...*।

আর সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছেন একজন মানুষ, তিনি গুরুজী। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো নদীতে ফেলে দেয়ার পরিবর্তে তিনি এক অদৃশ্য মায়ায় ও পরম ভালবাসায় সবাইকে যুক্ত করেছেন সবার সঙ্গে, তাদের অন্তরকে করেছেন বিকশিত।

প্রতিটি কর্মী জোনাকির মতো অন্তরের শক্তি দিয়ে কোয়ান্টামমে আলো জ্বেলে চলেছেন, আলোকিত করছেন চারপাশকে। গুরুজী সার্থক তার চিন্তায়, তার কর্মে।

৩০ জানুয়ারি ২০১৯

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন।
প্রকৃতি দেহ-মন ও আত্মার মাঝে
সবসময় ভারসাম্য এনে দেয়।

মস্তিষ্ক মানুষকে মানুষ বানায় নি,
হৃদয় মানুষকে মানুষ বানিয়েছে।
বিশ্বজনীন মমতার নিবাস হচ্ছে হৃদয়।

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার।
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের
(বারডেম) নবজাতক ইউনিটের প্রধান।
বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন ও
বাংলাদেশ নিওন্যাটাল ফোরামের সহ-সভাপতি।

event.quantummethod.org.bd

পরিবারে ইতিবাচকতা শিশুর সুবিকাশ নিশ্চিত করে

সা হি দা আ খ তা র

আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা হলো, শিশুর যত্ন শুরু করতে হবে তার জন্মের পর থেকে। কিন্তু এটি আরো আগে থেকেই শুরু হওয়া জরুরি। সেটা কীভাবে?

আজ যে মেয়েশিশুটি একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, ভবিষ্যতে সে-ই তো একদিন মা হবে। আমরা যদি তাকে সুন্দর শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বড় করে তুলি, ভালো আচরণ শেখাই, প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাই এবং পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেই—তাহলে সে ভবিষ্যতে সুস্থ সুন্দর শিশুর জন্ম দেবে। একজন ভালো মা হবে। শুধু মেয়েশিশুদের বেলায়ই নয়, ছেলেশিশুদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে সত্যি।

টিভি-তে একটি সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। একটি ছেলেকে ছোটবেলা থেকেই বলা হচ্ছে : 'তুমি ছেলে না! তুমি কাঁদবে কেন? ছেলেরা কাঁদে না।' পরের দৃশ্যে দেখা গেল, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করেছে। স্ত্রী কাঁদছে। তখন বলা হলো, 'ছেলেরা কাঁদে না' এটা না শিখিয়ে তাকে শেখানো উচিত ছিল 'ছেলেরা কাউকে কাঁদায় না'। অর্থাৎ সে যেন কারো কান্নার কারণ না হয়। কারো কষ্টের কারণ না হয়। কাউকে কষ্ট না দেয়।

সুস্থ পরিবার গঠনের জন্যে শৈশব থেকেই আসলে এ মানবিক শিক্ষাগুলোয় আমাদের ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। কিছুদিন আগে একটি মেয়ে এলো আমার চেম্বারে। তার বাবা বললেন, একটু শব্দ হলেই

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমার মেয়েটি ভয় পায়। কুঁকড়ে যায়। অস্বাভাবিক আচরণ করে। জিজ্ঞেস করলাম, কবে থেকে এরকম হচ্ছে? বললেন, দু-মাস ধরে।

আমি মেয়েটির সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলাম। বাবাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ওকে বললাম, বলো তো বাবু, তুমি কেন এরকম করো? বাচ্চাটা বলল, 'আমার আব্বু যদি আম্মুকে মেরে ফেলে!' তারপর সে ঠিকই সত্যটা বলে দিল আমাকে। ওর মাকে রড দিয়ে পিটিয়েছে ওর বাবা। সেদিন থেকেই তার প্রতিমুহূর্তের আতঙ্ক–বাবা না তার মাকে কোনদিন মেরেই ফেলে!

একটি শিশুর প্রথম জগৎ তৈরি হয় তার মা-বাবাকে ঘিরে। তারপর তার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্যরা। যখন সে দেখে তার মা-বাবার মধ্যে নিত্য-অশান্তি নির্যাতন সহিংসতা, এ দৃশ্যগুলো সারাক্ষণই তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার মনোজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে যায়।

শিশুর কোমল মন এ বিষয়টি নিতে পারে না। মনে হয়, এসব কী ঘটছে! জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টা সে পার করে তখন। সে-সময় তার যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। ফলে ধীরে ধীরে সে গুটিয়ে নেয় নিজেকে। অন্যদিকে দেখা যায়, যে-সব দম্পতির মধ্যে মনের মিল থাকে, সুসম্পর্ক থাকে, তাদের সন্তানরা হয় বুদ্ধিদীপ্ত, স্বতঃস্ফূর্ত ও সপ্রতিভ।

আবার শিশুর জন্মের আগে থেকেই মা-বাবা কিংবা পূর্বপুরুষের কোনো কোনো আচরণও শিশুর জিন-কে প্রভাবিত করতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় বিষয়গুলো উঠে আসছে।

সম্প্রতি উরুগুয়ে গিয়েছিলাম একটি মেডিকেল কনফারেন্সে। ওখানে পঠিত এক গবেষণা-প্রবন্ধে বলা হয়, একটি শিশুর মধ্যে কিছু জিনগত ত্রুটি ধরা পড়ে এবং তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে চমকপ্রদ তথ্য। প্রায় ছয় দশক আগে সেই বাচ্চাটির পূর্বপুরুষদের কেউ ধূমপায়ী ছিলেন, আর সে কারণেই এ ত্রুটি।

আজকাল অনেক সেমিনার-কনফারেন্সে বলা হয়, মা যখন গর্ভধারণ করেন তাকে ধূমপান করতে নিষেধ করো। কিন্তু কথা হলো, তখন ধূমপান বন্ধ করে লাভ কী? এমনও শুনেছি, একই রুমে গর্ভবতী স্ত্রীর পাশে বসে স্বামী ধূমপান করছে! মানা করলেও নাকি শুনতে চায় না। এতে সেই মা এবং তার গর্ভস্থ শিশু দুজনেই কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

তাই সুস্থ সন্তানের জন্যে একদিকে যেমন আগে থেকেই মা-বাবা

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

দুজনকে এসব বদভ্যাস বর্জন করতে হবে, তেমনি অভ্যস্ত হতে হবে পুষ্টিসম্মত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ ও ভালো আচরণে। এটা যে কেবল তাদের নিজেদের সন্তানের জন্যেই মঙ্গলজনক তা নয়, বরং এর সুফল পাওয়া যাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, মায়ের মধ্য দিয়েই যেহেতু সন্তান বেড়ে উঠছে, তাই সবদিক থেকেই মাকে ভালো রাখতে হবে। তার আনন্দ, সুখানুভূতি, হতাশা, বিষণ্নতাসহ সব ধরনের অনুভূতির সাথে গর্ভস্থ সন্তানের যোগাযোগটা একেবারে সরাসরি। মা যদি কোনো কারণে স্ট্রেস-আক্রান্ত হন, তবে তার দেহে প্রবাহিত স্ট্রেস হরমোনগুলো গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে। তাই এ সময় মায়ের শরীর-মন যত ভালো থাকবে, শিশুর সুস্থতার সম্ভাবনাও তত বেশি। মায়ের পাশাপাশি বাবার সচেতনতাও খুব জরুরি।

আর শিশুর জন্মের পর একটি বড় দায়িত্ব হলো, তাকে সুস্থ ও প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কৌটার দুধ ও প্যাকেটজাত খাবারের ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে বলতে বলতে আমরা হাঁপিয়ে উঠছি। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে মা-বাবারা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বাহারি বিজ্ঞাপনের প্রতাপে এখন আমাদের মায়েদের বুকের দুধ প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার দশা!

ইদানীং আরেকটি সমস্যা হলো, মা-বাবারা তাদের পুরোটা সময়ই ব্যয় করছেন একটি/ দুটি সন্তানের পেছনে। ফলে সবকিছু তারাই করে দিচ্ছেন, সন্তান কিছুই নিজে করতে শিখছে না।

এ কারণে দেখা যাচ্ছে, একটি শিশুর যেখানে ১০ মাস বয়সে নিজে খেতে পারার কথা, সেখানে ১০ বছর বয়সেও সে তা পারছে না। সেদিন দেখি, ১৫ বছরের একটি মেয়েকে তার বাবা খাইয়ে দিচ্ছেন। সে যে নিজে খাবে, এটাই তাকে শেখানো হয় নি।

আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম এসব ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলছে। বান্দরবানের লামায় যেভাবে প্রকৃত শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও আনন্দময় সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে হাজারো ছেলেমেয়েকে আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে, দেশের সব শিশুকেই যদি এভাবে মানুষ করা যেত, তাহলে আমাদের দেশটা সত্যিই অনেক সুন্দর হতো।

মা-বাবাদের আমরা বলি, শিশুকে কারো সাথে তুলনা করবেন না। সে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

যদি আপনার প্রত্যাশামতো কিছু করতে না-ও পারে, তবু তাকে ক্রমাগত ইতিবাচক কথা বলুন যে, তুমি পারবে। একসময় সে ঠিকই পারবে। কোয়ান্টামও তা-ই বলে। পরিবারে ইতিবাচকতার এ চর্চাটা শিশুর সুবিকাশের জন্যে খুব জরুরি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স যাদের, তারা সবাই শিশু। এ শিশুরা ও তরুণ-তরুণীরা অর্থাৎ হবু মা-বাবারা যারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছেন, তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তারা এ কোর্স থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন, কারণ এর সুফল তারা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম ধরে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

প্রযুক্তি

speech.quantummethod.org.bd

জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী।
শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষক। বাংলাদেশে
প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তি জগতের অগ্রনায়ক।
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য।
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

event.quantummethod.org.bd

বিদেশি অনুদানের প্রত্যাশা জাতিকে করে মানসিক প্রতিবন্ধী

জা মি লু র রে জা চৌ ধু রী

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগের কথা। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরপরই যোগ দিলেন সরকারি কর্মকর্তা পদে এবং কাঁধে নিলেন বাংলাদেশের একমাত্র ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের গুরুদায়িত্ব। বাবাকে দেখেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন জাগে আমার মধ্যে। ছেলেবেলায় যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করত–কী হতে চাও, আমি সোজাসাপ্টা জবাব দিতাম 'ইঞ্জিনিয়ার হবো!'

১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমাকে। আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আকর্ষণীয় অফারগুলো উপেক্ষা করে আমি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার সবসময় মনে হতো, এ জীবনে যদি কিছু দিয়ে যেতে পারি তা আমার মাতৃভূমিকেই দেবো।

সে অর্থে আমি সৌভাগ্যবান যে, দেশে ও দেশের বাইরে বহু ধরনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। সরকারি-বেসরকারি এসব প্রকল্পে কখনো উপদেষ্টা, কখনো চেয়ারম্যান, কখনো পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। ১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়, তা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ধরা হয়। তখন আমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে গেছি সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে। শুধু ত্রাণ বিতরণই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, সেইসাথে সাইক্লোন শেল্টার স্থাপনের জন্যে টিম নিয়ে ঘুরেছি টেকনাফ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

শ্যামনগর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলা এবং হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরাসহ বিভিন্ন চরাঞ্চলে। বাংলাদেশের এলাকাভিত্তিক ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও কাজ করেছি এবং এটাই ছিল দেশে এ ধরনের প্রথম কোনো উদ্যোগ।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই প্রবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে একটা যুক্তি কাজ করে– বাংলাদেশে থেকে প্রফেশনাল স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। কিন্তু আমি বলি, বাংলাদেশে আমি যত ধরনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, বিদেশে এতটা সুযোগ কেউ পান বলে শুনি নি।

একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও দেশে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের কাঠামো নির্মাণে কাজ করতে পেরেছি সেই সূচনালগ্নে। আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল উচ্চ ইমারতের নকশা প্রণয়ন। কম্পিউটার প্রযুক্তিকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম টল বিল্ডিং ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে, যা এ-কাজে নতুন মাত্রা যোগ করে। এর আগে প্রকৌশলীদের জন্যে এ-কাজটি ছিল বেশ কঠিন, শ্রমসাধ্য ব্যাপার। আমি মনে করি, দেশের প্রতিটি মানুষ যদি নিজ নিজ অবস্থানে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে, তাহলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জাতির উন্নয়নের পথে অন্যতম দুটি প্রতিবন্ধকতা হলো–বিদেশি সাহায্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধান্তহীনতা। এদেশেও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তহীনতার দেখা মেলে। আমরা দ্রুত একটি চূড়ান্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তুতি হিসেবে দীর্ঘ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় কাজ বা উদ্যোগটি এক ধরনের অ্যানালাইসিস-প্যারালাইসিস চক্রে ঘুরতে থাকে, বাস্তবায়িত হয় না।

আর বিদেশি অনুদানের আশায় বসে থাকলে জাতি কখনো বড় কাজ করতে পারে না। অথচ স্ব-অর্থায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়েই আমরা চমৎকারভাবে এগোতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আমার পেশাগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। তখন আরিচা-নগরবাড়িতে নদীর ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হবে। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রজেক্ট ডিজাইনটি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ খুঁজতে লাগল। বিদেশি ডিজাইনাররা পিডিবিকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোমাদের দেশে এই ডিজাইন চেক করার মতো লোক আছে? সব শুনে আমরাও বিষয়টিকে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। ডিজাইনটি খুঁটিয়ে দেখা হলো এবং বিদেশি সেই ডিজাইনেই বিশেষ করে টাওয়ারের ফাউন্ডেশনে কিছু ভুল ধরা পড়ল!

আরেকটি ঘটনা হলো, ১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিলের জলোচ্ছ্বাসের পর আমাদের দেশের সরকার ইউএনডিপি-কে সাইক্লোন শেল্টারের মাস্টার প্ল্যান করে দেয়ার প্রস্তাব করলেন। ইউএনডিপি প্রস্তাবে রাজি হয়ে দুই মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করল এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞ পাঠানোর উদ্যোগ নিল। বাংলাদেশ সরকার তখন বেশ কাঠখড় পুড়িয়েই ইউএনডিপিকে বোঝাল–এ-কাজের জন্যে বাংলাদেশেই অভিজ্ঞরা রয়েছেন। বুয়েট ও বিড্স-এর যৌথ সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞ দল যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করলেন, তাতে পুরো কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হলো এবং অবিশ্বাস্যভাবে এতে ব্যয় হলো বাজেটের এক-চতুর্থাংশ অর্থ। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সেই কাজের প্রতিবেদনটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

আমার প্রকৌশলী জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় ছিল বঙ্গবন্ধু সেতুর কাজ। নির্মাণশৈলীর দিক থেকে শুরু করে সেতুর স্থান নির্বাচন, আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ–সব মিলিয়ে এটি ছিল পৃথিবীর অন্যতম চ্যালেঞ্জিং একটি প্রকল্প। আমাদের দেশের যমুনা নদীর বুকে এ সেতুর প্রাথমিক ও মূল নকশা তৈরি, কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজ করাসহ নির্মাণের দুই-তিন বছর পরও নির্মাতাদের বাড়তি মজুরির দাবি নিষ্পত্তি–সব মিলিয়ে দীর্ঘমেয়াদি এক সম্পৃক্ততা। এত ধরনের কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি সবসময়।

জীবনের অর্জনগুলোর জন্যে আমি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ। তবে যখন যে কাজ করেছি নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করেছি এবং সবসময় নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন থেকেছি।

আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশে এক আত্মবিশ্বাসী তরুণ প্রজন্মের, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বের দরবারে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে।

মুক্ত আলোচনা, ২৮ নভেম্বর ২০০৭

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। নিভৃতচারী এই বিজ্ঞানী প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিশেষত চিকিৎসাসেবায় নানা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের জন্যে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত।

event.quantummethod.org.bd

নিঃস্বার্থ তরুণ প্রজন্মই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী

আমি পিএইচডি করেছি ইংল্যান্ডে। সেই ১৯৭৪ সালেই দেখেছি–প্রযুক্তিগতভাবে ওরা অত্যন্ত উন্নত দেশ। সবাই কোনো না কোনোভাবে ওখানে প্রযুক্তির সাথে জড়িত। এমনকি যিনি আর্টসের শিক্ষক তিনিও পারতপক্ষে গাড়ির ইঞ্জিনটা নিজেই সারিয়ে নেন। এক শিক্ষককে একদিন দেখি বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বাড়ির ছাদটা নিজেই মেরামত করে তুললেন। এভাবে প্রযুক্তি ওখানে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

ফলে কী হচ্ছে? কোনো একজনের মনে হলো, এ-কাজটা এই জিনিসের সাহায্যে সহজ হয় এবং এটা তো আরো ১০ জনের কাজে লাগতে পারে। তিনি ছেড়ে দিলেন ওটা বাজারে। এভাবেই কিন্তু তাদের বাজারে বিভিন্ন পণ্য ছড়িয়েছে, ওদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। বিজ্ঞানকে ওরা কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গবেষণাগারের ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখে নি, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের জন্যে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে।

তখন থেকেই আমার এ চিন্তাটা হতো–আমার দেশের মানুষের জীবনের মান উন্নত করার জন্যেও প্রযুক্তি দরকার। কিন্তু সেটা আমাদের কে দেবে? পাশ্চাত্যের লোকেরা এসে সেটা তৈরি করে দেবে না। করতে চাইলেও পারবে না, কারণ আমাদের আর ওদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কাজের ধরন ভিন্ন। এটা করতে হবে আমাদেরই।

একটা কথা ছাত্রদের আমি প্রায়ই বলি। যেমন, গ্রামের দরিদ্র কোনো পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ে হয়তো মেধাবী। পরিবারের বাকিরা

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আধাপেটা খেয়ে, না খেয়ে তাকে পড়ায়। তাদের আশা–সে একদিন পুরো পরিবারকে টেনে তুলবে। তেমনি এদেশের মানুষও আমাদের একইভাবে খাইয়েছে, পড়িয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে।

তারপর আমরা কী করছি? আমরা বলছি–দেশে তো আমার কাজের সুযোগ নেই। এখানে আমাকে যথেষ্ট মূল্য দেয়া হচ্ছে না। বিদেশে যে অর্থ পেতাম, আরামে থাকতাম, এখানে তা পাচ্ছি না। কিন্তু একথা বলার নৈতিক যুক্তি আমাদের আসলে থাকে কি? আমরা লেখাপড়া করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করছি, সেজন্যে যে অর্থসম্পদ দরকার–সেটা কোত্থেকে এসেছে? আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছি, এর ব্যয়ভার বহন করছে কে? সবটাই এসেছে এদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে।

তাই আমরা বিশেষত যারা প্রযুক্তির শিক্ষা পেয়েছি, তারা যদি দেশে ফিরে এদের জন্যে কাজ না করি–তাহলে তা হবে অত্যন্ত অনৈতিক কাজ। এ বোধটা তখন থেকেই আমার মধ্যে একটা তাড়না সৃষ্টি করল। মনে হয়েছিল, মানুষ হিসেবে আমার জীবন একটাই। জীবনটা যেন অর্থবহ হয়। তাই একটাই চিন্তা তাড়া করে ফিরত আমাকে–কবে দেশে ফিরে যাব।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম। দেশে তখন কোনো চাকরিও ছিল না আমার। একরকম ঝুঁকি নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। অনেকে একে পাগলামিও বলেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আগ্রহে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। প্রথমেই বুঝতে চাইলাম–কী ধরনের গবেষণা করলে মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কারণ সামর্থ্যের মধ্যে না হলে সবাই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। তাই পথ খুঁজছিলাম, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে এসেছি কোন ক্ষেত্রে কাজ করলে তা পূরণ হবে। প্রযুক্তি-গবেষণায় এই দিকগুলো বিবেচনায় রাখা জরুরি বলে আমি মনে করি।

প্রথম পর্যায়ে শিক্ষকদের সাথে ও পরবর্তীকালে ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-উপকরণ তৈরি করি, যা এদেশে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বেশ ভালো ফল পান। যেমন, ভাঙা হাড় জোড়া দিতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্টিমুলেটর, স্নায়ু-কার্যকারিতা পরীক্ষার যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসায় ডায়নামিক পেডোগ্রাফ, অতিরিক্ত হাত-পা ঘামা রোগীদের জন্যে প্রয়োজনীয়

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

এন্টি-সোয়েট আয়োন্টোফোরেসিস, কৃত্রিম হাত ইত্যাদি। যেটুকু করতে পেরেছি সেজন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসব উদ্ভাবন বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সেমিনার-কনফারেন্সে আমরা উপস্থাপন করেছি। উন্নত দেশগুলো বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। একবার এক কনফারেন্সে আমাদের উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের নমুনা দেখে একটি সুইস কোম্পানির ডিরেক্টর এসে বলেন, আমরা তোমাদের এই যন্ত্রটিতে বিনিয়োগ করতে চাই, তবে তার আগে তোমাদের এটা পেটেন্ট করতে হবে। তাকে বললাম, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা পেটেন্ট করব না।

মালয়েশিয়ান একটি প্রতিষ্ঠানও আমাদের গবেষণায় অর্থায়ন করতে চেয়েছিল। তাদেরও দাবি—একটা যন্ত্র পেটেন্ট করতে হবে এবং এর স্বত্ব তাদের দিতে হবে। আমরা যথারীতি রাজি হই নি।

আজকের পৃথিবীতে বৈষম্যের মূলে রয়েছে এই পেটেন্ট। যার ফলে কিছু লোক প্রযুক্তি কুক্ষিগত করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে গেছে, আর অধিকাংশই বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে সাড়ে সাত বিলিয়ন মানুষের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন মানুষই আজ বঞ্চিত। এজন্যে আমরা পেটেন্ট করতে চাই না। প্রযুক্তিকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই মানবতার কল্যাণে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমরা হয়তো লোকসান করছি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বহুদূর। আমরা বিশ্বাস করি—আমরা পারব। আমাদের প্রচুর মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে। ওদের উদ্যম আছে, ওরা কাজ করতে চায়। এদের অনেকেই এসে বলে, স্যার, আপনার সাথে কাজের সুযোগ পেলে বিদেশে যাব না। এখানেই গবেষণা-পিএইচডি করতে চাই।

প্রথমদিকে আমি বলতাম—পয়সা তো দিতে পারব না, চলবে কী করে? ওরা বলত, টিউশনি করে চলব। এজন্যে পরিবার থেকে অনেক কথাও শুনতে হয়েছে ওদের—'তুমি একজন মেধাবী ছাত্র। সুযোগ থাকতেও কেন ইউরোপ-আমেরিকায় যাবে না?' কিন্তু এমন অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়েও তারা আজ দেশেই কাজ করছে, গবেষণায় ভালো করছে।

নিঃস্বার্থ তরুণ প্রজন্মের উদ্যম দেখে আমার একটা কথাই মনে হয়—আমরা অগ্রজরা যদি এদের পথ দেখাতে পারি, তবে এরাই একদিন নিজেদের স্বপ্ন ও কাজ দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মুক্ত আলোচনা, ৭ আগস্ট ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ।
শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক।
অক্লান্ত পরিশ্রম ও মমতায় তিনি এদেশে গড়ে
তুলেছেন প্রোগ্রামিং-এ বিশ্বমানের এক দক্ষ
প্রজন্ম। তার হাত ধরেই এদেশের তরুণরা অংশ
নিতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশ্বের
সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা
এসিএম আইসিপিসি-তে। বাংলাদেশে গণিত
অলিম্পিয়াড শুরু করার ক্ষেত্রেও তিনি
একজন নেপথ্য নায়ক।

event.quantummethod.org.bd

আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

গত শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান গণিতবেত্তা পল আর্ডশ। তাকে নিয়ে একটা কথা প্রচলিত ছিল–তার যাবতীয় সম্পদ একটা মাত্র টিনের বাক্সেই রাখা যেত, যা নিয়ে তিনি ক্রমাগত এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বছরজুড়ে বিশ্বের অন্তত ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশ নিতেন। ওসব সেমিনারে তার পাশে কেউ দেড়-দুই মিনিটের বেশি বসতে পারত না। বিজ্ঞানীরা যিনি যে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না, তিনি সেই সিটে বসে সেটা আর্ডশকে বলতেন। শুনে তিনি একটুক্ষণ ঝিমাতেন, তারপর মিনিট দুয়েক পরেই সমাধানটা বলে দিতেন এবং ওটাই একটা রিসার্চ পেপার হয়ে যেত।

একদিন শুনি, পল আর্ডশ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। আমি তখন ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে ডক্টরেট করছি। আর্ডশকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব পেল যে দুজন, তার মধ্যে আমি একজন। ভদ্রলোককে সেই আমার প্রথম দেখা। গাড়ি থেকে নামলেন খুবই ছোটখাটো একজন মানুষ। পুরু লেন্সের চশমা দিয়ে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্ন– 'হোয়াট ইজ ইওর প্রবলেম?'

একজন আগন্তুকের প্রতি সাধারণত ওটাই হতো তার প্রথম বাক্য। প্রবলেমটা বললাম। মিনিটখানেক পর তিনি বললেন, ইট ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট প্রবলেম। একসময় তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। যতদূর বুঝলাম নামটা তার পছন্দ হলো না। বললেন, কলকাতা পর্যন্ত গেলেও

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। খুব গরিব দেশ। আমি বললাম, আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশ গরিব কিনা। অস্ট্রেলিয়া আমাদের চেয়ে ৮৭ গুণ বড় দেশ। কিন্তু প্রতি বর্গকিলোমিটারে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের জনঘনত্ব বেশি। আমার উত্তর শুনে তিনি বেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আমরা আসলেই গর্ববোধ করতে পারি–সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদে এত ছোট জায়গায় এত মানুষ নিয়ে আমরা টিকে আছি। আমাদের গর্ব করার আরো কারণ আছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে অবস্থা তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে গিয়ে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান পারার কথা নয়। কিন্তু ওরা ঠিকই পারছে।

লেখাপড়ায় ভারতের অনেক নামডাক। কিন্তু পদক তালিকায় তারা আমাদের চেয়ে পিছিয়ে। এবছরই ইরানে অনুষ্ঠিত ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে আমরা ব্রোঞ্জ পেয়েছি চারটা, আর ভারত তিনটা। ১৯৯৯ সালে আইআইটি কানপুরে গেলাম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইবিএম ইন্ডিয়ার প্রধান বললেন, ১৯৯৮-এ বিশ্বসুন্দরী হয়েছে ভারত থেকে। আগামীকাল প্রমাণ করব মেধায়ও আমরা শ্রেষ্ঠ। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো বুয়েট আর রানার-আপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যেন পরিণত হলো শোকসভায়। পরের বছরও একই ফলাফল করলাম আমরা।

আসলে সময় এখন বাংলাদেশের। বিশ্বসেরা হওয়ার মেধা আমাদের ছেলেমেয়েদের আছে। তাদের প্রাণশক্তিও অনেক। এই প্রাণশক্তি নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই আমরা বহুদূর যেতে পারি। কোরিয়া যেমন পেরেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে ওরা দারুণ উন্নতি করেছে। তাদের ভদ্রতাবোধও অসাধারণ। চলন্ত সিঁড়িতে কারো হয়তো খুব দ্রুত যাওয়া দরকার। তিনি সামনের জনকে 'এক্সকিউজ মি'-ও বলবেন না। চুপচাপ পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন, সামনের যাত্রী কোনোভাবে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়ার কথা নিজে থেকে বুঝতে পারেন, এই আশায়।

কোরিয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখেছি, কোনো মা হয়তো তার সন্তানকে নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। অন্য রাস্তায় চলে যাওয়ার সময় সেই মা তার সন্তানকে বলবেন–হাত নেড়ে সে যেন আমাকে বিদায় জানায়। এটাই তো উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতি। এখানেই আমাদের উন্নতি প্রয়োজন।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সেইসাথে কমাতে হবে আমাদের অপচয়-প্রবণতা। এদেশে যত খুশি গাড়ি কেনা যায়। সিঙ্গাপুরে, জাপানে ইচ্ছা করলেই গাড়ি কেনা যায় না। সুইজারল্যান্ডের মতো ধনী দেশে পুরো বিল্ডিংয়ের মানুষ একটা ওয়াশিং মেশিন ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে। আর আমাদের দেশে প্রতি পরিবারে আলাদা ওয়াশিং মেশিন।

পৃথিবীর অনেক দেশেই উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতির চর্চা আছে। রাশিয়াতে পড়ার সময় দেখেছি, লেনিনের জন্মদিন তারা পালন করত রাস্তাঘাট-পার্ক পরিষ্কার করে। নেতার জন্মদিন পালনের কী অভিনব পদ্ধতি! গ্রীষ্মের ছুটিতে রাশিয়ান শিক্ষার্থীরা চলে যেত সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে রেললাইন তৈরি করে তারপর যেতে হতো। শিক্ষার্থীরা ওখানে শহর নির্মাণ করে ফিরে আসত। এর মধ্য দিয়ে ওদের হৃদয়ে দেশপ্রেম প্রোথিত হতো– আমি আমার দেশের একটা শহর তৈরিতে অবদান রেখেছি! দেশ জাতি সমাজের প্রতি ভালবাসা গড়ে উঠবে এমন কর্মসূচি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো অনুপস্থিত।

পার্শ্ববর্তী দেশেও দেশপ্রেমের মাত্রাটা এমনই। একবার লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর যাচ্ছি। গঙ্গার ওপরে একটা ব্রিজ দেখিয়ে ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কবে বানানো হয়েছে? সে গর্বের সাথে বলল, ১৯৭১ সালে এবং এটা বানিয়েছে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা! এই হলো একজন সাধারণ ট্যাক্সিচালকের দেশপ্রেম! আমরা এমন কয়টা ব্রিজ বা ভবন দেখিয়ে এভাবে বলতে পারব যে, এটা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বানিয়েছে?

আমাদের তাই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি বুঝতে পারি আমাদের অবস্থান কোথায় তাহলে বুঝতে পারব কোনদিকে হাঁটতে হবে, কোনদিকে আমাদের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের নাগরিকদের মধ্যে আজ এমন একটা সচেতনতা দরকার– যারা সমাজের উন্নতি কীভাবে হবে সেটা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তা করবে। শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিকভাবে দৃঢ় হবে। দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহারে পরিচয় দেবে উদ্ভাবনী শক্তির। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজের মানুষের মধ্যে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করছে, যা দেশ ও জাতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

মুক্ত আলোচনা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

এম রেজাউল হাসান।
বিশিষ্ট প্রযুক্তি-উদ্যোক্তা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে
তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান
রিভ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার।
২০০৩ সালে শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে
এ প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্বপরিসরে
অর্জন করে চলেছে উত্তরোত্তর সাফল্য।

event.quantummethod.org.bd

সঙ্ঘে একাত্মতাই আমার সাফল্যের রহস্য

এ ম রে জা উ ল হা সা ন

২০০৯ সালে একবার আন্তর্জাতিক বাজারে ইসরায়েলিদের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। প্রযুক্তি জগতে ওরা কিন্তু সবচেয়ে দক্ষ। কিন্তু যে সফটওয়্যার প্রোগ্রামটি লিখতে ওদের ৩০০ কিলোবাইট জায়গার প্রয়োজন হয়েছিল, আমরা সেটা লিখেছিলাম মাত্র ৮০ কিলোবাইটে! ফলে আয়োজক প্রতিষ্ঠান আমাদের পণ্যটিই বেছে নেয়। এটি আমার জীবনের অন্যতম অর্জন। আমরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি এবং জয়ী হয়েছি।

আমরা শুকরিয়া আদায় করি, ৭৮টি দেশের ২৫০০ অপারেটর আমাদের পণ্য ব্যবহার করছে। মোবাইল ভিওআইপি ও আইপি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে *রিভ সিস্টেম* বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানি *এয়ারটেল*-এর আইপি কল সফটওয়্যার ও পুরো প্রক্রিয়াটি *রিভ সিস্টেমের* তৈরি।

বাংলাদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান যে আইপি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে একদিন বিশ্ব পরিসরে নেতৃত্ব দিতে পারে, তা মাত্র দেড় দশক আগেও অনেকেই এমনকি এদেশের প্রযুক্তি নীতি-নির্ধারকরাও কল্পনা করতে পারেন নি।

২০০৩ সালে মাত্র ছয় জন কর্মী নিয়ে রিভ সিস্টেমের যাত্রা শুরু করেছিলাম আমরা, ঢাকার খিলগাঁওতে আমার বাবার গ্যারেজ থেকে। এই ছয় জনের মধ্যে দুজন আবার বাবুর্চি ও ড্রাইভার। আজ রিভ গ্রুপের হেড

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

অফিস সিঙ্গাপুরের মতো ব্যয়বহুল একটি দেশে। আর আমাদের কোম্পানিতে রয়েছেন ১৭টি ভিন্নভাষী সহকর্মী। এর পাশাপাশি আমাদের রয়েছে ফ্যাশন হাউজ (লা রিভ) ও প্রোপার্টিজের ব্যবসা।

উদ্যোক্তা হিসেবে জীবন শুরু করার আগে আমি ভালো বেতনের একটি চাকরি করতাম। তখন দেশে আইসিটি বলতে ছিল আউটসোর্সিং অর্থাৎ পাশ্চাত্যের একজন একটা প্রোডাক্ট চিন্তা করবে আর আমাদের দক্ষতা দিয়ে তার সৃজনশীলতাকে আমরা বাস্তব রূপ দেবো।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছি, এই সৃজনশীলতা আমাদেরও আছে। এই বিশ্বাস আমরা পেয়েছি কোয়ান্টাম থেকে। কোয়ান্টামে আমরা চর্চা করি– *আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব*। আমাদের আত্মবিশ্বাসের উৎস ছিল এটাই।

আর সামনে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম মন্ত্র ছিল শুকরিয়া। শুকরিয়া কীভাবে একজন মানুষকে বা একটি প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়, তার একটি বাস্তব উদাহরণ দেই। ২০০৭ পর্যন্ত আমরা কাজ করতাম শুধু বিলিং সফটওয়্যার নিয়ে। আইপি কমিউনিকেশন, যে প্রোডাক্টে আমরা এখন বিশ্বসেরা, সেটা নিয়ে আমরা তখন কাজ শুরু করেছি মাত্র। সে-সময় আমাদের প্রচণ্ড আর্থিক চাপ। আমি রীতিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, ন্যূনতম দাম পেলে কোম্পানির ৫০ শতাংশ মালিকানা বিক্রি করে দেবো।

২০০৮-এ বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দেন, আইজিডব্লিউ লাইসেন্স দেয়া হবে। অর্থাৎ দেশে যত আন্তর্জাতিক কল আসবে-যাবে তার গেটওয়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবসা। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যে এটা ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। আমরা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে নিলামে অংশ নিয়েছিলাম। কারণ নিলামে অংশ নিতে যে ১৫ কোটি টাকা মূলধন দেখাতে হয় তা আমাদের ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলামে আমরা হেরে গেলাম। ছোট একটা কারণ দেখানো হলো, যদিও সেটা আসলে হেরে যাওয়ার মতো বড় কোনো ভুল ছিল না।

নিলামের পরদিন পুরো অফিস একেবারে থমথমে। এমন সুযোগ হাতছাড়া হওয়াতে সবাই হতাশ। আমাদের কর্মীরা এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কেননা আমাদের মতো তিন বছর আন্তর্জাতিক বাজারে কাজের অভিজ্ঞতা ও আইপি ক্ষেত্রে দক্ষতা, বাংলাদেশে সে-সময় আর

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

কোনো প্রতিষ্ঠানের ছিল না। তাই এটা পাওয়ার যোগ্যতা আমাদেরই ছিল সবচেয়ে বেশি।

আমি তখন সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম। বললাম, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমরা লাইসেন্স পাই নি। তার চেয়ে আমরা যা নিয়ে কাজ করছি, তাতে মনোযোগ দেই। লাইসেন্স হলে আমরা এই ব্যবসার সুযোগ পেতাম ঠিকই, কিন্তু দেশের গণ্ডিতেই আটকে থাকতাম। কিন্তু এখন আমাদের সুযোগ আছে–আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের পণ্য নিয়ে বিশ্বসেরা হওয়ার। চলুন, আজ থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। সবাইকে উজ্জীবিত করার জন্যে মিটিংয়ের পর সহকর্মীদের নিয়ে সেদিন একসাথে বাইরে ডিনার করলাম।

আজ উপলব্ধি করি, সেই চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমরা যদি শোকরগোজার হতে না পারতাম কিংবা হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে কিছুতেই আজকের অবস্থানে আসতে পারতাম না। ২০০৮-এর মে মাসে আমরা নিজেদের তৈরি আইপি সফটওয়্যার বাজারজাত শুরু করি। প্রক্রিয়াধীন অবস্থাতেই আমাদের পণ্য সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে।

আমার খুব প্রিয় একজন উদ্যোক্তা হচ্ছেন ডেল কোম্পানির মাইকেল ডেল। তিনি পড়াশোনা করেছেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। তার প্রযুক্তিজ্ঞান যে খুব বেশি ছিল, তা কিন্তু নয়। তিনি তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি কাজে লাগিয়ে ডেল কোম্পানিকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

একাডেমিক জীবনে আমিও কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু গুরুজী সবসময় বলেন, 'ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন মানুষ যে-কোনো অবস্থান থেকেই জীবন শুরু করতে পারেন'। আমিও এ কথাটিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি। কম্পিউটার সম্পর্কে আমি অল্প যেটুকু জানতাম তা দিয়েই একটু একটু করে শুরু করেছি।

অনেকেই জানতে চান, আমাদের প্রতিষ্ঠানের আজকের সাফল্যের মূল রহস্যটা কী? উত্তরে আমি বলি–এই দীর্ঘ সময় ধরে সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকতে পারা। আমাদের যাত্রাপথে স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর এজন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি ও দিক-নির্দেশনা আমরা বরাবরই পেয়েছি কোয়ান্টাম থেকে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানেও আমরা চেষ্টা করেছি কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করতে। আমাদের অফিসে প্রতিদিনের কাজ আমরা শুরু করি

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

মেডিটেশন দিয়ে। কোয়ান্টামের মতোই আমাদের প্রতিষ্ঠানেও আমরা ছোট-বড় সবাইকেই সম্মানের সাথে 'আপনি' সম্মোধন করে কথা বলি।

আমি মনে করি, ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্যে শুধু ভালো একটি পণ্য থাকলেই হয় না। অনেক কিছু মিলেই আসলে একটি প্রতিষ্ঠান সফল হয়। দেশে-বিদেশে সবসময় আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম থেকে পাওয়া বিনয়ের শিক্ষাটা কর্পোরেট জগতে ক্লায়েন্টদের মন জয় করতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

২০০৭ সাল পর্যন্ত যতদিন আমি ঢাকায় থাকতাম কখনো শুক্রবার সাদাকায়ন মিস করি নি। এখনো করি না। আমি মনে করি, সাপ্তাহিক সাদাকায়ন-আলোকায়ন প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত অংশ নেয়া একজন মানুষের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে খুব জরুরি।

একবার একটি প্রোগ্রামে গুরুজী আমাকে বলেছিলেন, 'মেডিটেশন নিয়মিত করবেন। কাজের তুলনায় অর্জন অনেক বেশি হবে'। আরেকটি কথা আমি বিশ্বাস করি, দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের হয়ই কিন্তু সৎসঙ্গে থাকার সুবিধা হচ্ছে, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো বুঝতে পারা যায়। পাওয়া যায় সেগুলো সমাধানের পথও।

আলোকায়ন, ৯ জানুয়ারি ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

হাজার মাইলের অভিযাত্রাও শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। তাই আপনার যা আছে তা নিয়েই, যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন।

কোনো পরাজয়ই ব্যর্থতা নয়, যদি সে পরাজয় মানসিকভাবে আপনাকে পরাজিত করতে না পারে।

ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষিবিজ্ঞানী।
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিনা)
উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
বিভাগীয় প্রধান। কৃষি গবেষণায় উল্লেখযোগ্য
অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে তিনি
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক
আণবিক শক্তি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে 'আউটস্ট্যান্ডিং
অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন।

event.quantummethod.org.bd

কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশের সাফল্য অভাবনীয়

মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম

দেশের নানা প্রান্তে কৃষি গবেষণার কাজ করতে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। দেড় যুগ আগের কথা। আমরা কয়েকজন গবেষক বরেন্দ্র এলাকার একটি প্রত্যন্ত ও দুর্গম গ্রামে গেলাম। জমিতে এক্সপেরিমেন্ট সেট করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওদিকের রাস্তাঘাট তখন খুব খারাপ ছিল, বুঝলাম শহরে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। এদিকে আবার পরদিন ভোরে মাঠে আসতে হবে। অগত্যা রাতটা স্থানীয় একজন কৃষকের বাড়িতেই কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গিয়ে দেখি, আমাদের থাকতে দেয়ার মতো যৎসামান্য জায়গাও সেই কৃষকের বাড়িতে নেই। আমার দেশের কৃষকের এমন দুরবস্থা দেখে খুব কষ্ট হলো। চোখে পানি চলে এলো। ঐ বাড়ির উঠানে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে সে-রাতে মনে হলো, এদেশের কৃষকের হাতে যদি উন্নত প্রযুক্তি ও ভালো ফসল আমরা তুলে দিতে না পারি, তবে কে দেবে?

আমি তাই সবসময় দেশের জন্যে কাজ করতে চেয়েছি। ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (ইরি) পিএইচডি করতে গেলাম। চার বছর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার পর আমাদের দল লবণসহিষ্ণু ধানের জিন ম্যাপিং আবিষ্কার করে। বিশ্বে এ ধরনের কাজ ওটাই প্রথম। ইরি কর্তৃপক্ষ আমাকে ফিলিপাইনে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমি ফিরে এলাম। আমার বিশ্বাস ছিল–আমাদের এই ছোট্ট দেশে থেকেই বহু কিছু করার সুযোগ আছে। চাই শুধু প্রবল ইচ্ছা ও কাজের প্রতি আগ্রহ।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

কর্মজীবনের শুরু থেকেই সুযোগ খুঁজেছি–কীভাবে বেশি কাজ করা যায়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা একটি এসাইনমেন্ট দিলে আমি আরো একটি চেয়ে নিতাম। তাই যখন কাউকে কাজে ফাঁকি দিতে দেখি, আমার খুব দুঃখ হয়। অধিকাংশ মানুষ কম কাজ করে বেশি ফল চায়। কিন্তু দায়সারাভাবে কাজ করে তো কখনো অসাধারণ কিছু অর্জন করা যায় না।

অনেকে বলে, এত কাজ করে কী হবে, এদেশে কাজের মূল্য নেই। আমি মনে করি, এ ধরনের কথা যারা বলে তারা আসলে আমাদের শত্রু। তারা বোকার স্বর্গে বাস করে।

একটা ঘটনা বলি। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণাকালে আমি গ্রিন হাউসে কাজ করতাম। বাইরে বরফ পড়ছে, অথচ ভেতরে ৬০-৭০ ডিগ্রি তাপমাত্রা। ঐ গরমে আমি প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে কাজ করেছি। এক বন্ধু বলল, 'ইউ আর জাস্ট লাইক আ স্কুলবয়! এখনো কি ফার্স্ট হতে হবে নাকি? আমেরিকা এসেছ, কোনোরকমে কাজটা শেষ করে একটা থিসিস জমা দিয়ে চলে যাও।'

আমি কোনো উত্তর দেই নি। কী দরকার? আমি নিজের মতো কাজ করে গেছি। এর ফলও খুব দ্রুতই পেলাম। ২০১০ সালে বিনা-র বিজ্ঞানীরা লবণসহিষ্ণু ধান বিনা-৮ উদ্ভাবন করেন। সে দলের নেতৃত্ব দেয়ার সৌভাগ্য হয় আমার। আনন্দের কথা, কৃষি গবেষণায় আমাদের চেয়ে অগ্রসর দেশ ভারত অনুরোধ জানাল এই ধানটি উৎপাদনের প্রযুক্তিজ্ঞান আমাদের কাছ থেকে নেয়ার জন্যে। প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই অত্যন্ত উদারচেতা। তাই দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশে লবণসহিষ্ণু ধানের প্রযুক্তি আমরা পৌঁছে দিয়েছি। বিনা-৮ ধান সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানচর্চায় ও ফসলের জাত উদ্ভাবনে নতুন মাইলফলক।

অল্প সময়ের মধ্যেই সাফল্যের পাল্লা আরো ভারী হলো। বন্যাসহিষ্ণু ধান, উন্নত জাতের সরু চাল ও মাত্র ১০০ দিনে আবাদযোগ্য ধানের জাতসহ মোট ১৯টি ফসলের জাত আমরা উদ্ভাবন করেছি। আর ২০১৬ সালে উদ্ভাবন করেছি সার ও পানি সাশ্রয়ী 'গ্রিন সুপার রাইস'।

কাজ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন আমরা হয়েছি। মানবসৃষ্ট পারিপার্শ্বিক বাধা যেমন ছিল তেমনি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবে হতাশ হই নি। প্রতিটি প্রতিকূলতার মধ্যেই থাকে নতুন সম্ভাবনার বীজ। এর প্রমাণ আরো একবার পেলাম ২০০৯ সালে।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার জন্যে উন্নত জাতের লবণসহিষ্ণু ধান উদ্ভাবনে বহু বছর কাজ করেছি। একবার পরীক্ষামূলকভাবে কয়েক শ চারা লাগালাম। হঠাৎ 'আইলা' আঘাত হানল। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল পুরো এলাকা। ধরেই নিলাম, চারাগুলো নিশ্চয়ই মারা গেছে। কদিন পর বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, একটা চারা কীভাবে যেন বেঁচে আছে। স্যালিনিটি টেস্টে চারাটি উতরে গেল, আর তা থেকেই উদ্ভাবিত হলো লবণসহিষ্ণু ধান বিনা-১০। অর্থাৎ পরিস্থিতি যা-ই হোক কখনো হাল ছাড়া যাবে না।

আমি বিশ্বাস করি, আমার যা সাফল্য তা শুধু আমার মেধার জোরে নয়। দিনের পর দিন আল্লাহর কাছে আমি চেয়েছি–'হে আল্লাহ! আমার প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কৃষকের ও দেশের মানুষের কল্যাণ হয়, তাহলে আমাকে সাফল্য দাও।' দেশ ও মানুষের জন্যে কিছু করতে পারলাম কিনা–এটাই আসলে সবার কাজের মূল প্রেরণা হওয়া উচিত। এ চিন্তাটা সবসময় সামনে থাকলে একজন মানুষ অসাধারণ অর্জনের শক্তি পায়।

তবে চাওয়াটা হতে হবে প্রবল, কে কী বলল সেদিকে তাকানোর সুযোগ নেই। লক্ষ্য স্থির হলে কাজে মনোনিবেশ সহজ হয়। মেডিটেশন এ-ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক। মেডিটেশন মস্তিষ্কের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর পথ বাতলে দেয়। মনের শক্তিকে সংহত করে। আমরা যে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করি, সেটাও একপ্রকার মেডিটেশন।

অনেকে আমাকে বলেন, 'তুমি কেন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করো না? তাহলে দেশে বসেই অনেক টাকা উপার্জন করতে পারো!' বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও নিয়মিত এ প্রস্তাব দেয়। আমি বিনয়ের সাথে তাদের বলি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আমরা যে প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করছি, সরকার তা মানুষকে বিনা পয়সায় দিতে পারছে। দেশের মানুষকে আমরা সাধ্যমতো এ সেবাটা দিতে চাই।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও আমাদের পক্ষে এখানে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কৃষি গবেষণায় আমাদের সাফল্য কিন্তু অভাবনীয়। সম্প্রতি একটা কর্মশালায় ১৪টি দেশের বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গেছেন। কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমরা এ দেশকে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই–যেন ইউরোপ-আমেরিকার গবেষকরা এসে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : নভেম্বর ২০১৬

speech.quantummethod.org.bd

অধ্যাপক ড. মাহবুব মজুমদার।
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড দলের কোচ।
তার গত এক দশকের নিরলস প্রচেষ্টায়
২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে
প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক অর্জন করে
বাংলাদেশ। নিভৃতচারী এ গণিতবিদ ব্র্যাক
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং
এমআইটি-র আঞ্চলিক উপদেষ্টার
গুরুদায়িত্ব পালন করছেন।

event.quantummethod.org.bd

শিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা যে-কোনো প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব

মাহবুব মজুমদার

বাংলাদেশে প্রথম ম্যাথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালে। তখন মনে করা হতো—এদেশের ছেলেমেয়েরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একটি গাণিতিক সমস্যাও সমাধান করতে পারবে না। যদিও ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ সবসময়ই আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জেতার স্বপ্নও তারা দেখেছেন সেই শুরু থেকেই।

সময় বদলেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ অনেক আত্মবিশ্বাসী। পূর্ববর্তী দলের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে নতুন দল এখন ক্যাম্পে আসে। অথচ আগে ওদের মধ্যে এক ধরনের ভয় ছিল—আমরা কি পারব? সেই ওরাই এখন দৃঢ়স্বরে বলে—আমরাই পারব। বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া কিশোর-তরুণদের উৎসাহ-উদ্দীপনাই আমাকে এ-কাজে আরো বেশি আকৃষ্ট ও আশান্বিত করেছে।

আমি বেড়ে উঠেছি যুক্তরাষ্ট্রে। সেই শৈশবেই আমার বাবা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—এমআইটি একটা সুন্দর জায়গা, তুমি এখানেই পড়বে। এ-ছাড়াও তার অনুপ্রেরণায় আমি গণিতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। এভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নিতেই একসময় গণিতের প্রকৃত আনন্দটা পেলাম। আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে গণিত, যার কল্যাণেই এমআইটি-র মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আমার জন্যে সহজ হয়েছিল।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

২০০৫ সালে আমি এই ভেবে বাংলাদেশে এসেছিলাম যে, এখানে আমি নিভৃতে বসে নিজের গবেষণার কাজগুলো করতে পারব। মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার আমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। সেই সূত্রেই বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে আমার যুক্ত হওয়া। কারণ যিনি শিক্ষকতা করতে ভালবাসেন, তিনি সবসময় এমন মানুষদের সাথে থাকতে পছন্দ করেন, যারা নতুন কিছু জানতে ও শিখতে আগ্রহী।

শুরুর দিকে গণিত অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করে আমার প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটত। আমি ম্যাথ ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের সাথে থাকতাম, প্রচুর ক্লাস নিতে হতো, অনেক সময় আমার বাসাতেও আসত শিক্ষার্থীরা।

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া পুরনো শিক্ষার্থীরাও এখন ক্লাস নিচ্ছে নতুনদের। আমাদের গণিত অলিম্পিয়াডে কোনো সিনিয়র-জুনিয়র বিভেদ নেই। সিনিয়ররা যেমন জুনিয়র দলকে শেখাচ্ছে তেমনি জুনিয়রদের কাছ থেকেও কখনো কখনো শিখছে সিনিয়ররা। ভেদাভেদ শেখার পরিবেশকে নষ্ট করে। আমাদের ম্যাথ ক্যাম্পে শেখার মানসিকতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রতিযোগীরা এগিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদক জয় আমাদের জন্যে জাতিগতভাবে একটি আনন্দের বিষয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—শুধু কি এই আনন্দটুকুই? এ-ছাড়া জাতির কি কোনো লাভ নেই এতে? ধরুন, ব্রাজিল গণিত অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে গেল। এতে কি তাদের জিডিপি বেড়েছে? তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে? সত্যিই সেটা ঘটেছে। দেশটি এগিয়ে গেছে। কারণ এ ধরনের স্বীকৃতিগুলো জাতিকে আরো উদ্যমী করে তোলে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন এই কিশোরদের সাফল্য দেখে, তখন তাদের মনেও বিশ্বাস জাগে—আমরাও পারব। তরুণদের এ বিশ্বাসই সমাজের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনে।

তবে উন্নত দেশের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্যে রয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা আর আধুনিক অবকাঠামো। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শুধু মেধা ও চেষ্টার জোরেই ভালো করছে। গাছ তো প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে, কিন্তু পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন একটু পানি ও সার দেয়া। তেমনি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই সঠিক পথ-নির্দেশনা, যথাযথ পরিচর্যা ও সুস্থ পরিবেশ। আর এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আরেকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে অভিভাবকদের। তা হলো– আপনার সন্তানের বন্ধু কে–এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ যুগে মা-বাবা কী বলছেন, তার চেয়েও শিশু-কিশোরদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার বন্ধুরা কী বলছে। গণিত ভয় পায় বা শেখার আগ্রহ নেই, এমন বন্ধুর সাথে মিশলে আপনার সন্তানও তেমনটাই হবে। আবার আপনার ছেলেমেয়ে যদি এমন কারো সাথে বন্ধুত্ব করে, যে গণিত ভালবাসে তাহলে আপনার সন্তানেরও গণিতের ভয় দূর হবে। তাই আপনি তাকে স্কুলের গণিত ক্লাব বা এরকম ভালো কিছু কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।

ভালো ছেলেমেয়েদের সাথে মিশলে আপনার সন্তান স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকবে। আবার তার বন্ধু যদি ভিডিও গেম খেলে, তাহলে সে-ও সেদিকেই যাবে। ভিডিও গেম কিন্তু ভীষণ আসক্তিকর। তাই অভিভাবকদের বলতে চাই, সন্তানের বন্ধুমহল সম্পর্কে সচেতন হোন।

শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলার জন্যে ভালো ক্লাসরুম-কম্পিউটারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষকের আন্তরিকতা। এ-ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি তারা শিক্ষকদের আন্তরিক হওয়ার ওপর জোর দেন, তবে একজন সাধারণ শিক্ষকও ভালো মানের শিক্ষকে রূপান্তরিত হবেন। আর একজন ভালো শিক্ষক হয়ে উঠবেন অসাধারণ।

গণিত অলিম্পিয়াডের উদ্দেশ্য শুধু স্বর্ণপদক জেতা নয়; বরং মানুষকে গণিত ও প্রযুক্তিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলা। দেশের ১০ জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিকভাবে ভালো ফলাফল করার অর্থ হচ্ছে এদেশে এমন আরো হাজার মানুষ আছে, যারা ভালো করার সামর্থ্য রাখে। গণিত অলিম্পিয়াডের লক্ষ্য হচ্ছে এমন কিছু মানুষ গড়া, যারা আগামী ২০ বছরে দেশের সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। আমরা এদের মধ্য থেকে ছয় জনের একটি দল কেন গঠন করতে পারব না–যারা গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম হতে পারে? একজন মানুষ বা একটি জাতি তখনই পারে, যখন তাদের সামনে থাকে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও প্রত্যাশা। আর শিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা যে-কোনো মানুষের পক্ষে যে-কোনো প্রত্যাশাই পূরণ করা সম্ভব।

মুক্ত আলোচনা, ৬ আগস্ট ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

ড. রুবাব খান।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান ও
সুপরিচিত বাংলাদেশি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী।
২০১৫ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ
গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'নাসা'-র গোডার্ড ফ্লাইট
সেন্টারে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে
কর্মরত থাকাকালে সূর্যের চেয়েও অতিকায়
পাঁচটি তারকা (সুপারস্টার) আবিষ্কারকারী
দলের নেতৃত্ব দেন তিনি।

event.quantummethod.org.bd

লক্ষ্যে অবিচল থাকুন সাফল্য আপনারই

রুবাব খান

ছোটবেলার কথা। লোডশেডিং হলে মা প্রায়ই আমাদের ছাদে নিয়ে তারা দেখাতেন–এটা সপ্তর্ষিমণ্ডল, ওটা মঙ্গল গ্রহ। মহাকাশ নিয়ে আমার আগ্রহটা তৈরি হয় মূলত তখনই। পরবর্তীকালে উদয়ন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। এতটা বছর পেরিয়ে আজ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এটি আমার জীবনের সেরা কোর্স।

কোর্সে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল মনছবির মেডিটেশন। সেদিন মনছবি করেছিলাম–আমি একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছি। বলা যায়, জীবনের লক্ষ্যটা আমি খুঁজে পেয়েছি মনছবির মেডিটেশনে। নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করলে এবং সৎসঙ্গে একাত্ম থাকলে একজন মানুষ সহজেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারবে এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে পারবে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে।

কোর্স করার পর শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপে আমি নিয়মিত অংশ নিতাম। একটি ওয়ার্কশপে গুরুজী বললেন, আজ মেডিটেশনে আপনারা নিজেদের ব্রেনের সাথে কথা বলবেন। সেদিন মেডিটেশনে আমার ব্রেন আমাকে বলেছিল, 'ভুলে যাও যে তুমি ভালো ছাত্র। আর তোমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবো।'

আজ মনে হয়, আমার ব্রেন সেদিন আমাকে খুব সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ আমার ভেতরে একটা গর্ব ছিল–যদিও ক্লাসে প্রথম হচ্ছি না কিন্তু আমি যদি চাই তবে ঠিকই হয়ে যাব। ব্রেনের পরামর্শ থেকে

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

বুঝলাম, এসব হেঁয়ালি ছাড়তে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগ দিতে হবে।

তখন বাংলাদেশে এস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না। অতএব দেশের বাইরে গিয়ে পড়তে হবে। এজন্যে প্রথমত, ভালো কোনো কলেজের রিকমেন্ডেশন লেটার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এইচএসসি-র পর স্যাট ও টোফেল দিতে হবে। আমি তাই এসএসসি-র পর থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

স্কুলে পড়ার সময়ই আমি ভালো কলেজে ভর্তির জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছি। নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলাম। বিদেশে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেতে হলে ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমও থাকতে হয়। তাই স্কুল ও কলেজে আমি ডিবেটিং ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব ও কালচারাল ক্লাবে সক্রিয় ছিলাম।

এইচএসসি-র পর যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম– যেখানে স্কলারশিপসহ এস্ট্রোফিজিক্স পড়তে পারব। এদিকে আমি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ভর্তিও হয়ে গেলাম। কেন? কারণ ১২ বছরের একটি কিশোর স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এইচএসসি পরীক্ষার্থী একজন তরুণের জন্যে সেই সাহসী স্বপ্ন দেখা ততটা সহজ নয়। বাস্তবতা আর নানারকম যুক্তি তার মনে ভর করে। আর এ-ক্ষেত্রে মেডিটেশন হতে পারে সবচেয়ে সহায়ক, যা একজন মানুষকে লক্ষ্যের জন্যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে শক্তি জোগায়।

তাই অভিভাবকদের অনুরোধ করি, আপনার সন্তানের বয়স সাত-আট বছর হলে তাকে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহলে সে লক্ষ্য স্থির করতে পারবে জীবনের শুরুতেই। সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন তাকে দেবে লক্ষ্যের পথে বাধা অতিক্রম করার শক্তি।

আমি দেখলাম উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা তিনটি। এক, বাংলা মিডিয়ামে পড়ে ইংরেজি ভালোভাবে শেখা হয় না। দুই, অর্থের সংস্থান আর তিন হচ্ছে, চেষ্টা না করা। ভাষা আমি ভালোভাবে শিখলাম। স্কলারশিপের প্রস্তুতি নিয়ে আবেদন করলাম, ফলে অর্থাভাব দূর হলো। আর শেষ হচ্ছে চেষ্টা বা লেগে থাকা। একজন মানুষ যখন চেষ্টা করে, প্রস্তুতি নেয়, সৌভাগ্য তার কাছেই ধরা দেয়।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমি সৌভাগ্যবান। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্ট্রোফিজিক্সে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলাম। মনছবিই ছিল এ-ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আমি যদি আগে থেকে প্রস্তুতি না নিতাম, তাহলে সৌভাগ্য আমার কাছে এলেও আমি সুযোগটা নিতে পারতাম না।

প্রথম সেমিস্টার থেকেই আমি গবেষণার খোঁজ নিতে শুরু করি। খুঁজতে খুঁজতেই সুযোগ পেলাম বড় ও আলোচিত একটি প্রজেক্টে কাজ করার। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময়ই এ প্রজেক্টের গবেষকদের নামের তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। গবেষকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ।

গ্রাজুয়েশনের পর পিএইচডি প্রোগ্রামে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি কাজের প্রস্তাব পেলাম। দেখলাম, ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাজের জন্যে সবচেয়ে ভালো হয়। ওখানে পিএইচডি শুরু করলাম।

পিএইচডির পর ২০১৪-তে আমি যোগ দিলাম যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে। নাসা আমাকে দুই বছরের জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ফেলোশিপ দেয়। এতে আমার মৌলিক গবেষণার কাজটিও আমি এগিয়ে নিতে পারলাম। ২০১৮ সালে নাসা এ টেলিস্কোপটি মহাকাশে পাঠাবে।

আমার গবেষণায় আমি ইটা ক্যারিনা-র মতো জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমন তারাগুলো খুঁজছিলাম। ডিসেম্বর ২০১৫-তে আমি পাঁচটি আলাদা গ্যালাক্সিতে এরকম পাঁচটি সুপারস্টার খুঁজে পেলাম। নাসা তাদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে জানায়। এ আবিষ্কারটি ছিল সে-রকমই একটি সাড়া জাগানো আবিষ্কার।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে ২০২৪ সালে ওয়াইল্ড ফিল্ড ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ পাঠানো হবে। এখন আমি সেটা নিয়ে গবেষণা করছি। পাশাপাশি আমার যে মৌলিক গবেষণা ছিল, তা-ও চালিয়ে যাচ্ছি।

তরুণদের বলি, মনছবির দর্শনটাকে নিজের মাঝে ধারণ করুন। সবসময় মনে রাখুন, আপনার লক্ষ্য কী, সে লক্ষ্যের জন্যে আজ আপনি কী করছেন। যতক্ষণ এই অনুভূতি ভেতরে থাকবে, যত বাধাই আসুক, যত সংকটের ভেতর দিয়েই আপনাকে যেতে হোক, মনছবির পথে অবিচল থাকতে এবং শেষ পর্যন্ত আপনি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনই।

সাদাকায়ন, ২৩ জুন ২০১৭

speech.quantummethod.org.bd

স্বপ্নের জন্যে রক্ত যখন ঘাম
হয়ে ঝরে, সেই নোনা পানিতেই
অঙ্কুরিত হয় সাফল্যের বীজ।

যার কথার চেয়ে কাজের পরিমাণ বেশি,
সাফল্য তার কাছেই এসে ধরা দেয়।
কারণ যে নদী যত গভীর, তার বয়ে
যাওয়ার শব্দ তত কম।

event.quantummethod.org.bd

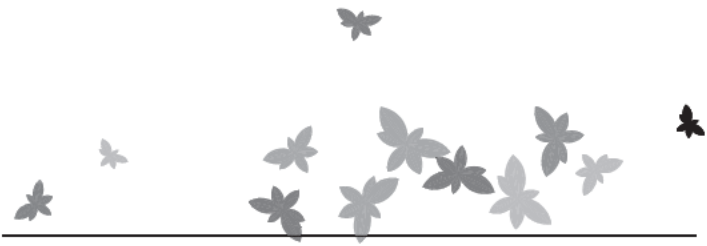

মানবপ্রেম

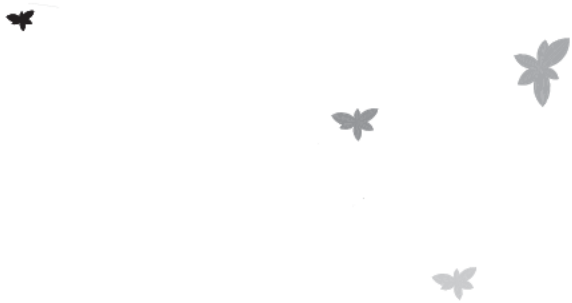

speech.quantummethod.org.bd

মহীয়সী ভ্যালেরি টেইলর।
ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত এই মানবহিতৈষী প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে গড়ে তুলেছেন সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজড বা পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)– যা আজ একটি বিশ্বমানের ফিজিওথেরাপি সেবা প্রতিষ্ঠান। মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে দেশে-বিদেশে বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ প্রদত্ত অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড, প্রিন্সেস ডায়ানা গোল্ড মেডেল, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং ডা. এম আর খান ও আনোয়ারা ট্রাস্ট গোল্ড মেডেল–এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এদেশে ভ্যালেরি টেইলরের জীবনভর ত্যাগ ও অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন।

event.quantummethod.org.bd

যদি আবার জন্ম নিই বাংলাদেশেই কাজ করতে চাই

ভ্যা লে রি টে ই ল র

২৫ বছর বয়সে আমি প্রথম বাংলাদেশে আসি–একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে। সেটা ১৯৬৯ সাল। সে-সময় ১৫ মাস এখানে কাজ করেছিলাম। তারপর নিজের দেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যাই।

এরপর আবার আসি ১৯৭১ সালে, যখন বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্র। সারা দেশে তখন অসংখ্য যুদ্ধাহত মানুষ। যন্ত্রণাক্লিষ্ট এই মানুষদের সেবা দিতে গিয়ে অনুভব করলাম, এদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ। সিদ্ধান্ত নিলাম–এদেশের অসহায় মানুষের পাশে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

সেই সিদ্ধান্তেরই বাস্তব রূপ আজকের সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজড (সিআরপি) বা পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র। সিআরপি-র শুরুটা ১৯৭৯ সালে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিত্যক্ত সিমেন্ট গোডাউনে চার জন রোগী নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। বছর কয়েক পরে হাসপাতালের প্রয়োজনে সেই গোডাউনটা ছেড়ে দিতে হয়।

শুরু হয় আমাদের তপস্যার জীবন। কারণ দুস্থ রোগীদের কেউ সহজে জায়গা দিতে চায় না। সিআরপি-কে বেশ কয়েকবার স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। হাসপাতালের জিনিসপত্র আর রোগী–এসব নিয়ে বার বার জায়গা বদলানো ছিল আমাদের জন্যে দুঃসহ এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি এই রোগীদের কখনো ছেড়ে যেতে পারি নি।

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

আমি মনে করি, বার বার জায়গাবদল আর এতরকম ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আমরা একটু একটু করে সিআরপি-কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় হয়েছি। অবশেষে ১১ বছর পর ১৯৯০ সালে সাভারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সিআরপি-র কেন্দ্রীয় অফিস। বর্তমানে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেটসহ দেশের ১২টি জেলা শহরে এর শাখা রয়েছে।

চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে সমমর্মী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাওয়াই সিআরপি-র লক্ষ্য। ঠেলাগাড়ি চালক, রিকশা চালক, রাজমিস্ত্রীদের মতো দরিদ্র মানুষদের অনেকেই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে এখানে আসে। অর্থাভাবের কারণে তাদেরকে বড় হাসপাতালগুলো ভর্তি নেয় না। অসহায় এই রোগীরা আশ্রয় পায় এ প্রতিষ্ঠানে। আমাদের কর্মীরা ধৈর্য, মমতা, যত্ন নিয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলেন। এরপর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবস্থা করা হয় তাদের পুনর্বাসনের।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসায় যে ধরনের অত্যাধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজন তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। হাতের কাছে যে কাঁচামাল পাওয়া যায়, তা দিয়েই অধিকাংশ চিকিৎসা-সরঞ্জাম তৈরি করা হয় সিআরপি-তে। কারণ এটা সাশ্রয়ী এবং রোগীদেরও প্রতিকূলতা জয় করতে শেখায়।

যেমন, হুইল চেয়ার বানানোর জন্যে আমরা ব্যবহার করে থাকি সাইকেলের চাকা, রিকশার যন্ত্রাংশ। রোগীরাও এগুলো তৈরি করতে শেখে। ফলে কখনো প্রয়োজন হলে যান্ত্রিক ত্রুটি তারা নিজেরাই মেরামত করতে পারে।

এ-ছাড়াও দরিদ্র রোগীদের জন্যে সিআরপি-তে রয়েছে বিদ্যুৎবিহীন মাটির বাড়িতে জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ। এখানে নিজের বাড়ির মতো বাঁশ, কাঠ, মাটির ঘরের দেয়াল ধরে তারা হাঁটতে শেখে, কাজ করতে শেখে। ফলে তারা যখন বাড়ি ফিরে যায়, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে খুব সহজেই।

আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি—সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরাও স্বাভাবিক কর্মময় জীবনযাপন করতে পারেন। নিজের এই বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি আমার সহকর্মীদের মধ্যেও। সিআরপি-তে এসে যত্ন, শুশ্রূষা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে সুস্থ হয়েছেন, এমন অনেকেই এখন এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কেউ রিসিপশনিস্ট, কেউ অসুস্থদের থেরাপি দিচ্ছেন, কেউ অন্যদের সাহস

speech.quantummethod.org.bd

event.quantummethod.org.bd

জোগাচ্ছেন। নতুন রোগীদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই কর্মীরা যখন নিজের সুস্থতার কথা রোগীদের বলেন, শারীরিক অনুশীলনে নিয়ে যান, জীবনকে নতুন করে শুরু করতে বলেন, তখন রোগীরা অনেক বেশি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।

সিআরপি-র মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের সুস্থ করে তোলার পর তাদের কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা। এদের মধ্যে শিক্ষিতদের আমরা বলি—এসো, তোমরা শিশুদের লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করো। আর অক্ষরজ্ঞানশূন্য হলে তাদের বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শেখাই। এতে তারা নিজের এবং পরিবারের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হন। সমাজের বোঝা হয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হয় না। কাজের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে পান। আসলে কাজই তো আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে চলাচলে অক্ষম, অসহায়, ব্যথাক্লিষ্ট মানুষেরা যখন সিআরপি-তে আসেন, তখন তারা জীবন্মৃত। আমাদের এখান থেকে সেবা নিয়ে এ রোগীরা স্বাবলম্বী হয়ে বাড়ি ফিরে যান। এই রূপান্তর দেখাটা স্বর্গীয় আনন্দের। বার বার এই আনন্দের দেখা পেতেই আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। ঈশ্বর যদি আবার জন্ম দেন, তাহলে বাংলাদেশের মাটিতেই আমি কাজ করতে চাই।

মুক্ত আলোচনা, ৮ জানুয়ারি ২০১৮

speech.quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম প্রকাশিত আরো বই

- ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন
  : ড. এম শমশের আলী
- ভাঙো দুর্দশার চক্র
  : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
- রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা
  : নাহার আল বোখারী
- এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ (সংকলিত)
- কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা ১ (সংকলিত)
- কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা ২ (সংকলিত)
- সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন (সংকলিত)
- কর্মব্যস্ত সুখী জীবন (সংকলিত)

প্রচ্ছদ ও বই নকশা
মাসুম রহমান

RANGDHONU
production

আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম।
সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ
বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে
রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য।
স্ব–উদ্যোগ, স্ব–পরিকল্পনা ও স্ব–অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায়
সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয়
জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি।
কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো
মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়,
ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন।
কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন
আপনার জীবন।

quantummethod.org.bd

BIKOSHITO HOK
SHOTO BHABNA
BDT 240
USD 15

ISBN 978-984-34-6185-8

9 789843 461858

কোয়ান্টাম এর ওয়েবসাইট
ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

কোয়ান্টামের সকল প্রকাশনা
পড়তে স্ক্যান করুন